প্রাচ্যবাদের ইতিকথা

আবদুল্লাহ আল মাসউদ

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

অর্পণ

মুহতারাম উস্তাদ নাঈম আবু বকর সাহেবের ইলমী-ঈমানী-আমলী সুস্থ হায়াত কামনায়...

এক রৌদ্রমধুর দুপুরে দরসগাহে তাঁর দেওয়া প্রাচ্যবাদ-বিষয়ক একটি পাঠের সারসংক্ষেপ তৈরির নির্দেশই ছিল এই গ্রন্থের প্রথম বীজ। যা আজ অঙ্কুরিত হয়ে ডাল-পালায় সুশোভিত অবস্থায় মলাটবদ্ধ রূপ ধারণ করেছে। সেই নির্দেশ না হলে এই গ্রন্থরচনার ভাবনাটা হয়তো মনের জমিনে রোপিত হতো না— জাযাহুল্লাহু আহসানাল জাযা।

শুরুর আগে

প্রাচ্যবিদ্যা বা প্রাচ্যতত্ত্ব নিয়ে বাংলা ভাষায় রচিত বইপত্র খুবই অপ্রতুল। এই বিষয়টিকে ব্যাপকভাবে সামনে নিয়ে আসার পেছনে অন্যতম ভূমিকা ছিল কবি মুসা আল হাফিজের। তার লেখা 'প্রাচ্যবিদদের দাঁতের দাগ' প্রকাশিত হবার পর চারদিকে বেশ সাড়া পড়ে যায়। আমারও এই বিষয়ের সাথে প্রথম পরিচয় তার বইটি পড়ে। সেজন্য মুসা আল হাফিজের প্রতি কৃতজ্ঞতা।

তার বইটি যখন বাজারে আসে, সেসময় আমি উলুমুল হাদীসের প্রথম বর্ষের ছাত্র। আমাদের মুশরিফ ও মুহসিন উস্তাদ মাওলানা নাঈম আবু বকর সাহেব একদিন দরসে এটি নিয়ে আলোচনা করলেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের 'ইসলামী বিশ্বকোষ' থেকে প্রাচ্যবাদ-বিষয়ক লম্বা একটি প্রবন্ধের সারসংক্ষেপ তৈরি করে পরের দিন দরসে নিয়ে আসতে বললেন। আমি বেশ গুরুত্বের সাথেই কাজটা করেছিলাম। সেই সারসংক্ষেপটিই ছিল আজকের 'প্রাচ্যবাদের ইতিকথা' বইটির বীজ। এরপর এই বিষয়ে আরও অনেক বইপত্র সংগ্রহ এবং পড়াশোনা অব্যাহত রেখেছিলাম। যেহেতু নিয়ত করেছিলাম, সুযোগ হলে এই বিষয়ে স্বতন্ত্র ও গোছানো একটি বই রচনা করব। কেননা মুসা আল হাফিজ সাহেবের বইটি বিভিন্ন সময়ে প্রাচ্যবাদ বিষয়ে লেখা তার রচনাগুলোর সংকলন ছিল। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তা সুবিন্যস্ত ছিল না।

শুরুতে আমার নিয়ত ছিল প্রাচ্যবাদের প্রাথমিক পাঠরূপে বইটিকে রচনা করব। যেন সামগ্রিকভাবে প্রাচ্যবাদের সকল দিক এতে সংক্ষেপে চলে আসে। কিন্তু বইটির কাজ খুব ধীরগতিতে চলছিল। ইতিমধ্যে বাজারে প্রকাশিত হয় মুসা আল হাফিজের সম্পাদনায় অন্য আরেকটি বই 'প্রাচ্যবাদ ও ইসলাম'। সেখানে, আমি যেসব বিষয়ে লিখব বলে ছক তৈরি করে রেখেছিলাম, তার অনেক কিছুই চলে আসে। তাই রচনার গতিধারা পরিবর্তন করে ফেলি। যেন পাঠকদের সামনে এই বিষয়ে নতুন কিছু তুলে ধরা সম্ভব হয়।

'প্রাচ্যবাদের ইতিকথা' বইটিকে আমি চারটি অধ্যায়ে সাজিয়েছি।

প্রথম অধ্যায়ে যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, সংক্ষেপে তা হলো— প্রাচ্যবাদ ও প্রাচ্যবিদের পরিচয়, প্রাচ্যবাদের বিভিন্ন কাল পরিক্রমা, প্রাচ্যবিদদের শ্রেণিবিন্যাস এবং প্রাচ্যবাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বর্ণনা। এই অধ্যায়ে মোট চারটি পরিচ্ছেদ আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, সংক্ষেপে তা হলো— প্রাচ্যবিদদের নানান কৌশলে মুসলিম দেশের বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ, সেগুলো প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যে নিয়ে যাওয়া, ইউরোপীয় বিভিন্ন লাইব্রেরিতে থাকা ইসলামি পাণ্ডুলিপির ইজমালি খতিয়ান ইত্যাদি।

তৃতীয় অধ্যায়ে যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, সংক্ষেপে তা হলো— মুসলিম-সমাজ ও মুসলিম-মানসে প্রাচ্যবিদদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মন্দ প্রভাব, প্রাচ্যবিদদের বিভিন্ন রচনার পর্যালোচনা এবং বাংলা ভাষায় রচিত ইসলামি ইতিহাস-বিষয়ক বইপত্রে প্রাচ্যবাদী মনোভাবের বিস্তার।

চতুর্থ অধ্যায়ে যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, সংক্ষেপে তা হলো— প্রাচ্যবিদদের ভাষাগত আগ্রাসনের নানান দিক, আরবি ভাষাবিরোধী চক্রান্ত ও তাদের বিভিন্ন যুক্তির জবাব এবং এই বিষয়ে আলিমদের সতর্কাবস্থান ইত্যাদি।

প্রাচ্যবিদদের বিভিন্ন জ্ঞানগত কর্মের মূল্যায়ন বিষয়ে স্বতন্ত্র একটি অধ্যায় রাখার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি পাবার আশঙ্কায় তা পরিহার করতে হয়েছে। যদিও বিভিন্ন আলোচনার ভেতর দিয়ে অল্প পরিসরে হলেও তা শিরোনামহীন চলে এসেছে। তা ছাড়া এই বইটি প্রাচ্যবাদ-বিষয়ক রচিত প্রথম বই। আশা করছি, এই ধারা সচল থাকবে এবং সামনে এই বিষয়ে আরও কয়েকটি বই আসবে ইনশাআল্লাহ।

বইটি প্রকাশের প্রাক্কালে দুজন ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করাটা অকৃতজ্ঞতা হয়ে যাবে। একজন হলেন বন্ধুবর ও সহপাঠী আশিকুর রহমান। ভারত সফরে গেলে তিনি আমার অনুরোধে আজমগড়ের শিবলী একাডেমি থেকে প্রকাশিত প্রাচ্যবাদ-বিষয়ক কয়েক খণ্ডের রচনা 'ইসলাম আওর মুস্তাশরিকীন' সিরিজটি সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। অন্যজন হলেন শিবলী ভাই। ইংল্যান্ডের আল-ফুরকান ইনস্টিটিউট থেকে প্রকাশিত আরবি পাণ্ডুলিপি-বিষয়ক বিশালাকৃতির ৪ খণ্ডের একটি সিরিজ তিনি আনিয়ে দিয়েছিলেন। এই দুজনের সহায়তা না পেলে, সিরিজ দুটি আমার হস্তগত হবার আর কোনো আপাত মাধ্যম ছিল না। তাদের প্রতিদান আল্লাহর কাছে তোলা থাকল।

পুরো বইটির ওপর নজর বুলিয়ে দিয়েছেন বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক ডা. শামসুল

আরেফীন ভাই। বেশ কিছু পরিবর্তন ও পরিমার্জনের পরামর্শও দিয়েছেন তিনি। তার এই আন্তরিকতার জন্য অনেক অনেক শুকরিয়া।

বইটি প্রকাশের গুরুভার কাঁধে নেওয়ায় সন্দীপন প্রকাশনের কর্ণধার রোকন ভাইকে অন্তরের অন্তস্তল থেকে কৃতজ্ঞতা। তার আন্তরিকতা আর বারংবার খোঁজ নেওয়া কাজটিকে যথাসময়ে শেষ করতে সহায়ক ছিল।

বইটিকে আমরা যথাসম্ভব নির্ভুল করার চেষ্টা করেছি। তবুও মানুষ যেহেতু ভুলের ঊর্ধ্বে নয়, তাই আমাদের অজান্তে এতে ভুলভ্রান্তি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। এমন কিছু নজরে এলে আমাদেরকে জানানোর অনুরোধ থাকবে। পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরে নেবো ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা বইটিকে কবুল করে নিন। এর ফায়দাকে ব্যাপক করুন। যারা এর পেছনে সময়-শ্রম দিয়ে একে মলাটবদ্ধ রূপ দিয়েছেন—সবার জন্য রইল আন্তরিক দুআ। জাযাহুমুল্লাহু আহসানাল জাযা।

আবদুল্লাহ আল মাসউদ
abdullahmasud887@gmail.com

বিষয়সূচি

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ ১৭

প্রাচ্যবাদের পরিচয় ১৭

শাব্দিক পরিচয় ১৭

পারিভাষিক পরিচয় ১৭

অপশ্চিমা ও মুসলিম পণ্ডিত কি প্রাচ্যবিদ হতে পারে? ২১

ইস্তিশরাক, ইস্তিরাব ও ইস্তিগরাব ২৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ২৯

প্রাচ্যবিদদের আদি পুরুষ ২৯

প্রাচ্যবাদচর্চার প্রারম্ভকাল ৩০

প্রাচ্যবাদের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ৩২

প্রাচ্যবাদচর্চার প্রথম যুগ ৩২

প্রাচ্যবাদচর্চার দ্বিতীয় যুগ ৩৭

প্রাচ্যবাদচর্চার তৃতীয় যুগ ৪২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ৪৬

প্রাচ্যবিদদের শ্রেণিবিভাগ ৪৬

কয়েকজন নিষ্ঠাবান প্রাচ্যবিদ ৪৯

১. আদ্রিয়ান রিল্যান্ড ৪৯

২. জোহান জ্যাকব রেইস্ক ৫১

৩. টমাস আর্নল্ড ৫৩

৪. গুস্তাভ লি বোন ৫৪

৫. সিগরিড হুনকে ৫৫
৬. জ্যাক বার্ক ৫৬
৭. সিলভেস্ট্রে ডি স্যাসি ৫৭

ইসলাম গ্রহণকারী প্রাচ্যবিদ ৫৮

১. নাসিরুদ্দিন দিনাত ৫৯
২. আবদুল করিম জারমানুস ৬০
৩. মুরাদ হফম্যান ৬২
৪. মুহাম্মদ আসাদ ৬৪
৫. রেনে গেনোঁ ৬৬
৬. রজার গ্যারাডি ৬৭
৭. মুহাম্মাদ মারমাডিউক পিকথল ৬৯

একটি সতর্কবার্তা ৭০

চতুর্থ পরিচ্ছেদ **৭২**

প্রাচ্যবাদচর্চার কারণ অনুসন্ধান ৭২

এক. ধর্মীয় উদ্দেশ্য ৭২
দুই. জ্ঞানগত গবেষণার স্পৃহা ৭৪
তিন. সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা ৭৭
চার. রাজনৈতিক অভিলাষ ৮১
পাঁচ. অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি অর্জন ৮২

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামি পাণ্ডুলিপির ওপর প্রাচ্যবিদদের শকুনদৃষ্টি **৮৭**

ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদদের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ৮৯
ইতালিয়ান প্রাচ্যবিদদের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ৯১
ফরাসি প্রাচ্যবিদদের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ৯৩
ডাচ প্রাচ্যবিদদের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ৯৫
স্পেনের দখল করা ইসলামি পাণ্ডুলিপির করুণ ইতিহাস ৯৬
অন্যান্য আরও প্রাচ্যবিদদের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ১০১
কৌশল করে সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি ১০২
পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের ব্যাপারে
মুসলিমদের উদাসীনতা ১০৩

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ ১১১

মুসলিম-সমাজে প্রাচ্যবাদের প্রভাব ১১১

প্রাচ্যবিদদের তিনটি মাধ্যম ১১১

আবু হুরাইরা ﵁-এর ওপর আপত্তির বাস্তবতা ১১৯

হাদীস অস্বীকারের ফিতনা ১২১

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাচ্যবাদের সাথে মিশনারিদের মেলবন্ধন ১২৫

মিশনারি ও বিদেশিদের স্কুল সম্পর্কে আলিমদের সতর্কবার্তা ১২৯

বাংলাদেশের চিত্র ১৩০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ১৩৩

আলফ্রেড গিয়োম (Alfred Guillaume) ও তার গ্রন্থের পর্যালোচনা ১৩৩

আলফ্রেড গিয়োমের পরিচয় ১৩৩

আসহাবে ফীলের ঘটনা অস্বীকার ১৩৪

বিশুদ্ধ ইরহাসাতকে অস্বীকার ১৩৫

ইসলাম ধর্ম অন্যদের থেকে ধার করে আনার অপবাদ ১৩৬

দেব-দেবীর নামে উৎসর্গিত প্রাণীর গোশত খাওয়ার অপবাদ ১৪০

আল্লামা সুহাইলির খণ্ডন ১৪৪

আলফ্রেড গিয়োমের 'সীরাতে ইবনু ইসহাক'-এর অনুবাদ ১৪৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ১৪৮

পি.কে. হিট্টি ও তার 'আরব জাতির ইতিহাস' গ্রন্থের বিকৃতি ১৪৮

মিরাজ নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি ১৫০

বুরাক নিয়ে বানোয়াট বয়ান ১৫১

বনু কুরাইযার ঘটনা নিয়ে ধুম্রজাল সৃষ্টি ১৫১

মারিয়া কিবতিয়াকে নিয়ে ভুলতথ্য ১৫৪

হাজরে আসওয়াদ নিয়ে অপলাপ ১৫৪

হুদাইবিয়ার সন্ধি নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি ১৫৫

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ১৫৭

বাংলাদেশের পাঠ্যবইতে প্রাচ্যবাদী প্রভাব ১৫৭

মদীনার শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে ভুল তথ্য ১৫৭

খিলাফতে রাশিদা নিয়ে মিথ্যাচার ১৫৮

সাহাবা-বিদ্বেষ ১৫৮
শিয়াদের বানোয়াট বর্ণনা ১৬০
পাঠ্যবইয়ের সহায়ক বইগুলোর অবস্থা ১৬১
সাধারণ মুসলিম লেখকদের লেখায় প্রাচ্যবাদের প্রভাব ১৬৫

চতুর্থ অধ্যায়

প্রাচ্যবিদদের ভাষাগত আগ্রাসনের নানান দিক ১৭১

প্রাচ্যবিদদের ভাষাগত আগ্রাসন ১৭১
ফুসহা আরবির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ১৭২
ষড়যন্ত্রের শুরু ১৭৩
আম্মিইয়্যাহ এর প্রতি আহ্বানকারী প্রাচ্যবিদেরা ১৭৪
আম্মিইয়্যাহ আরবির পক্ষে যুক্তি ও তার খণ্ডন ১৭৬
আরবি ভাষার সাথে ইউরোপীয় ভাষার তুলনা ১৭৮
উলামাদের প্রতিরোধ ও সচেতনতা ১৭৯
'মুসলমানি বাংলা' ভাষায় প্রাচ্যবিদদের হস্তক্ষেপ ১৮২

প্রথম অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়ে যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, সংক্ষেপে তা হলো—প্রাচ্যবাদ ও প্রাচ্যবিদের পরিচয়, প্রাচ্যবাদের বিভিন্ন কাল পরিক্রমা, প্রাচ্যবিদদের শ্রেণিবিন্যাস এবং প্রাচ্যবাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বর্ণনা। এই অধ্যায়ে মোট চারটি পরিচ্ছেদ আছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রাচ্যবাদের পরিচয়

শাব্দিক পরিচয়

প্রাচ্যবাদের পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে বিশেষজ্ঞদের সংজ্ঞার মধ্যে কিছুটা তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। সেই তারতম্যটা কোথাও আক্ষরিক ও উপস্থাপনার ঢঙের মধ্যে সীমাবদ্ধ; আর কোথাও বাস্তবিক অর্থেই সেটা বড় ধরনের পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত করে।

বিশেষজ্ঞদের সংজ্ঞাগুলোর ওপর চোখ বুলানোর পূর্বে আমরা প্রাচ্যবাদের শাব্দিক অবয়বের সাথে পরিচিত হয়ে নিই। এর মাধ্যমে পারিভাষিক অবয়বটা আরও ভালোভাবে আমরা বুঝতে পারব।

'প্রাচ্যবাদ' শব্দটির উৎপত্তি 'প্রাচ্য' থেকে। আরবিতে যাকে বলে 'شرق'। এর সাধারণ অর্থ হলো পূর্ব, পূব, প্রাচ্য, প্রাচ্যদেশ, প্রাচ্যজগৎ, সূর্য উদিত হওয়ার স্থান, পূর্বাঞ্চল ইত্যাদি।[১]

এই 'شرق' শব্দমূল থেকেই গঠিত হয়েছে 'استشراق' শব্দটি। যার অর্থ হলো প্রাচ্যের ভাষা-সাহিত্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জীবনাচার নিয়ে গবেষণা করা।[২]

পারিভাষিক পরিচয়

'প্রাচ্যবাদ'-এর শাব্দিক পরিচয় জানার পর এবার আমরা এর পারিভাষিক পরিচয়ের ওপর নজর দেবো। বিশেষজ্ঞদের উদ্ধৃতি ও তাদের প্রদান করা সংজ্ঞাকে উপস্থাপন করার পর এর থেকে প্রাপ্ত ধারণাকেও বিশ্লেষণ করে দেখব। এতে করে প্রতিটি সংজ্ঞার স্বরূপটা আমাদের কাছে আরও স্পষ্টরূপে ধরা দেবে। যেহেতু একে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে নানা মুনি নানা মত প্রদান করেছেন, তাই সেসব মতের আকার-আকৃতি ও গঠন-প্রকৃতি বোঝার জন্য তাকে বিশ্লেষণ করে দেখা ছাড়া কোনো উপায় নেই।

প্রথম পরিচয় :

[১] মুহীত ফিল লুগাহ : ১/১৬২; আধুনিক আরবি-বাংলা অভিধান : ৪৯৩, রিয়াদ প্রকাশনী।
[২] মুজামুল লুগাতিল আরাবিইয়াতিল মুআসারা : ২/১১৯২; আল-মুজামুল আরাবিইয়িল হাদীস : ৮২।

বাংলা ভাষার জনপ্রিয় জ্ঞানকোষ বাংলাপিডিয়াতে 'প্রাচ্যবাদ' শব্দের অধীনে এর পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'প্রাচ্যবাদ : ১৭৮৪ সনে প্রতিষ্ঠিত কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক পরিচালিত গবেষণা থেকে প্রথম আবিষ্কৃত হয় যে, সুদূর অতীতে ভারত তথা এশিয়ায় উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল এবং অনেক দিক থেকেই এ সভ্যতা ছিল বিশ্ব সভ্যতার অগ্রজ এবং চমকপ্রদ। এ সভ্যতাকে কেন্দ্র করে আঠারো শতকের শেষ পাদে এবং উনিশ শতকের প্রথম পাদে কলকাতা ও ইউরোপে ব্যাপক গবেষণা শুরু হয়। এ প্রচেষ্টায় প্রাথমিক নেতৃত্ব দেন স্যার উইলিয়াম জোনস ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি। প্রথম থেকেই প্রাচ্য-বিষয়ক সভ্যতা চর্চার নাম দেয়া হয় Orientalism বা প্রাচ্যচর্চা। তা ছাড়া বিশ্বপ্রেক্ষাপটে পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রাচ্যের তুলনামূলক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলনকেও বলা হয় প্রাচ্যবাদ বা প্রাচ্যচর্চা। ১৮৩০-এর দশকে Orientalism অভিধাটি প্রথম ফ্রান্সে প্রচলিত হয়। এরপর থেকেই প্রাচ্য-বিষয়ক জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যকে বিশেষায়িত করতে এক ধারার রোমান্টিক কল্পনাময় সাহিত্যকর্ম, ভাষা, ইতিহাস, স্থাপত্য, শিল্পকলাকেও বোঝানো হয় এবং এর মাধ্যমে পাশ্চাত্য কর্তৃক প্রাচ্যসম্পর্কিত এক ধরনের আদর্শিক উপলব্ধির প্রতিনিধিত্ব করানোর জন্যও এই প্রাচ্যচর্চা ও বিদ্যাকে কাজে লাগানো হয়। ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয় প্রাচ্যবাদ কেন্দ্র।'[৩]

প্রাচ্যবাদের যে পরিচয় বাংলাপিডিয়াতে দেওয়া হয়েছে—তা যে অনেক অসম্পূর্ণ ও অপূর্ণাঙ্গ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই জ্ঞানকোষটির বর্ণনাভঙ্গি থেকে অনুমিত হয় যে, প্রাচ্যবাদের উদ্ভব হয় আঠারো-উনিশ শতকের দিকে এবং এটি মূলত ভারতীয় ও এর আশপাশের এশিয়া অঞ্চলের সভ্যতা নিয়ে গবেষণা করাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। এই পরিচয়টি যে প্রাচ্যবাদের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করছে না—তা আমরা সামনের আলোচনাগুলোতে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারব। সেইসাথে বাংলাপিডিয়ায় প্রদত্ত এই পরিচয়টির ত্রুটিপূর্ণ দিকগুলোও আমাদের সামনে উন্মোচিত হবে।

দ্বিতীয় পরিচয় :

আবদুল মুতাআলী তাঁর 'আসসীরাতুন নববিইয়াহ ওয়া আওহামুল মুস্তাশরিকীন' গ্রন্থে বলেন, 'প্রাচ্যবাদ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, প্রাচ্যের প্রাচীন ভাষা, নতুন উচ্চারণ-নীতি, উপভাষা, ইতিহাস, লোকগাঁথা, স্বভাব-প্রকৃতি, ধর্ম এবং মানুষ, প্রাণীকুল, উদ্ভিদ, আবহাওয়া, মৃত্তিকা ইত্যাদি সকল বিষয়ে গবেষণা করা।'[৪]

---

[৩] প্রাচ্যবিদ্যা, বাংলাপিডিয়া, এশিয়াটিক সোসাইটি।

[৪] আবদুল মুতাআলী, আস-সীরাতুন নববিইয়াহ ওয়া আওহামুল মুস্তাশরিকীন : ০৯।

প্রাচ্যবাদের এই পরিচয়টি অনেক বেশি ব্যাপক ও বিস্তৃত। ফলে এর মধ্যে এমন অনেক বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে, যা আমাদের উক্ত গ্রন্থে আলোচিত প্রাচ্যবাদের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। তা ছাড়া এই পরিচয়ের মধ্যে এই বিষয়েও কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই যে, এই গবেষণা পাশ্চাত্য পণ্ডিত দ্বারা সম্পাদিত হওয়া শর্ত, নাকি প্রাচ্যের পণ্ডিতদের হাত ধরে তা সাধিত হলেও একে প্রাচ্যবাদ হিসেবেই আখ্যায়িত করা হবে। ফলে প্রাচ্যের কোনো পণ্ডিতের প্রাচ্যীয় বিষয় সম্পর্কে গবেষণাকেও প্রাচ্যবাদের আওতায় আনতে হয়। অনুরূপভাবে পাশ্চাত্য পণ্ডিতের প্রাচ্য সম্পর্কীয় যেকোনো গবেষণাকেও প্রাচ্যবাদের আওতাভুক্ত করে নিতে হয়। অথচ আমাদের কাছে পরিচিত ইস্তিশরাক বা প্রাচ্যবাদ এত ব্যাপক পরিসরের নয়। এটি আরেকটু সুনির্দিষ্ট।

তৃতীয় পরিচয় :

বাংলাদেশের প্রাচ্যবাদ গবেষক ও চিন্তক কবি মুসা আল হাফিজ তার সাড়াজাগানো 'প্রাচ্যবিদদের দাঁতের দাগ' গ্রন্থে লিখেছেন, 'মুসলিমদের জ্ঞানবিজ্ঞানে অমুসলিমদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস হচ্ছে প্রাচ্যবাদ। প্রাচ্যবিদ মানেই ইউরোপিয়ান এমন নয়। তিনি প্রাচ্যের একজন হতে পারেন। বস্তুত মুসলিম নন কিন্তু মুসলিমদের জ্ঞান রাজ্যে কর্তৃত্ব ফলাবার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি মাত্রই প্রাচ্যবিদ।'[৫]

এই পরিচয়টির মধ্যে মোটাদাগে কিছু বিষয় স্পষ্ট করা হয়েছে। প্রাচ্যবিদ হওয়ার জন্য প্রধান শর্ত হিসেবে দেখানো হয়েছে অমুসলিম হওয়াকে। পশ্চিমা হওয়ার প্রশ্নটা এই পরিচয়ের আলোকে গৌণ। সুতরাং একজন অমুসলিম গবেষক, যিনি ইসলাম নিয়ে গবেষণা করেন, তাকেও প্রাচ্যবিদদের কাতারে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়টি কতটুকু যৌক্তিক—তা সামনে স্বতন্ত্রভাবে আমরা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

চতুর্থ পরিচয় :

আবদুল কারীম খতীব বলেন, 'প্রাচ্যবিদ বলা হয় তাকে, যিনি প্রাচ্যের এক বা একাধিক; যেমন : আরবি, ইরানি, সুরিয়ানি, ফারসি ইত্যাদি ভাষার জ্ঞান অর্জন করেন। তারপর সেই ভাষার সহায়তায় ওই ভাষাতে লিখিত জ্ঞান-সমুদ্রে ডুব দেন। তারা বেশির ভাগই আরবি ভাষা শেখার প্রতি মনোযোগ দেন এবং এই ভাষার সাহিত্য, অলংকার প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করেন। ভাষাগত উৎকর্ষতা অর্জিত হওয়ার পরে তারা ইসলাম ধর্মের আকীদা ও শরীয়ত ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানার্জনের প্রতি মনোনিবেশ করেন। এটাই থাকে মূলত তাদের অধিকাংশের মুখ্য

[৫] মুসা আল হাফিজ, প্রাচ্যবিদদের দাঁতের দাগ : ৫০, মাকতাবাতুল আযহার, প্রথম প্রকাশ ২০১৫ খ্রি.।

উদ্দেশ্য।'[৬]

এই পরিচয়টি আমাদের সমাজে আলোচিত প্রাচ্যবাদের রূপ ফুটিয়ে তুলতে পারলেও তাতে সামান্য কিছু ত্রুটি রয়ে গেছে। কারণ প্রাচ্যবাদ চর্চাকারী কি পাশ্চাত্যের কেউ হবেন, নাকি প্রাচ্যের হলেও হবে; তিনি মুসলিম হবেন, নাকি অন্য ধর্মের হলেও হবে—সেই কথা সুস্পষ্টভাবে এতে বলা হয়নি। ফলে একটা ধোঁয়াশা ঠিকই বাকি থেকে যায়।

পঞ্চম পরিচয় :

ওপরে আমরা প্রাচ্যবাদ ও প্রাচ্যবিদদের পরিচয় নির্ণয় করতে গিয়ে নানা মুনির নানা মতের সাথে পরিচিত হয়েছি। এরকমই অনেক মতামত তুলে ধরে, সেগুলো বিভিন্ন আঙ্গিকে বিচার-বিশ্লেষণ করে ড. মোহাম্মদ আমীন হাসান শেষ পর্যন্ত যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন—সেটা সবচেয়ে সুন্দর ও সংগতিপূর্ণ মনে হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'এই শব্দটির (প্রাচ্যবিদ) পরিচয় এক কথাতে সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া কঠিনই বটে। তা সত্ত্বেও আমরা বলতে পারি, প্রাচ্যবিদ বলতে বোঝানো হয় ইহুদি-খ্রিষ্টান-নাস্তিক প্রভৃতি গোষ্ঠি, যারা প্রাচ্যের বিভিন্ন ভাষা, যথা : আরবি, ফারসি, ইবরানি, সুরিয়ানি ইত্যাদি শেখেন এবং তাদের অনেকে বিশেষভাবে আরবি ভাষা শেখা ও এই ভাষার নানা জ্ঞানবিজ্ঞান জানার প্রতি অধিক ব্রতী হন। যাতে করে এই অধ্যয়ন ইসলাম ধর্মকে আঘাত করার ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে।'[৭]

(এই পরিচয়েও অবশ্য সামান্য একটু ত্রুটি রয়ে গেছে। তা হলো, তার ভাষ্যমতে প্রাচ্যবিদ মানেই ইসলাম ধর্মের প্রতি বিরূপ—যে কিনা ইসলাম ধর্মকে আঘাত করার সুযোগ খুঁজতে থাকে। এতে করে যেসব প্রাচ্যবিদ কেবলই জ্ঞানগত স্পৃহার কারণে প্রাচ্যবাদের চর্চা করেছেন, ইসলামকে আঘাত করা যাদের উদ্দেশ্য ছিল না, তারাও দোষী সাব্যস্ত হচ্ছেন। অবশ্য, প্রাচ্যবিদদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যেহেতু এমনই ছিল, সেই বিবেচনায় এটি ঠিক আছে।)

প্রাচ্যবাদের পরিচয় নির্ণয়ের পেছনে এত মতভিন্নতা তৈরি হবার মূল কারণ হলো, এটি মূলত দুই ধরনের অর্থ বহন করে। একটি হলো ব্যাপক। অপরটি বিশেষায়িত। ফলে পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে কেউ এর ব্যাপক অর্থের প্রতি দৃষ্টি রেখেছেন, আর কেউ এর বিশেষায়িত অর্থের প্রতি।

---

[৬] আদদাওয়াতু ইলাল ইসলাম মাযামীনুহা ওয়া মায়াদিনুহা : ১০১, দারুল কিতাবিল আরাবি প্রকাশনী।

[৭] ড. মুহাম্মদ আমীন হাসান, আল-মুস্তাশরিকুন ওয়াল কুরআনুল কারীম : ১৬, দারুল আমাল, জর্ডান।

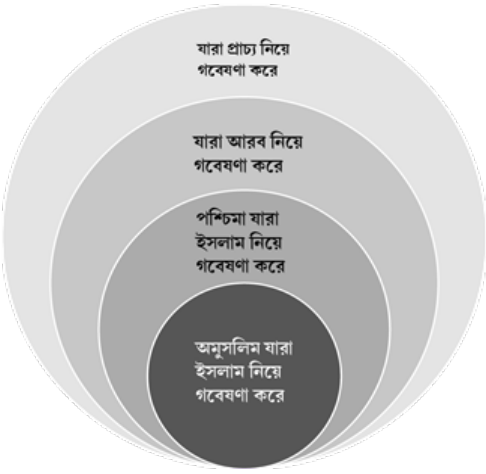

এই বিষয়ে ড. মাহমুদ হামাদীর সমাধানমূলক বক্তব্যটা বেশ জুতসই। তিনি বলেছেন, 'প্রাচ্যবিদ শব্দটি ব্যাপকার্থে প্রত্যেক সেসব পশ্চিমা পণ্ডিতকে বোঝায়, যারা প্রাচ্যের ভাষা-সাহিত্য ও ধর্ম-সংস্কৃতি থেকে শুরু করে সব বিষয়ে গবেষণা করে থাকেন।[৮] তবে আমরা যখন প্রাচ্যবাদ নিয়ে আলোচনা করি, তখন এই অর্থটি আমাদের উদ্দেশ্য হয় না। তা ছাড়া এটি আমাদের আলোচ্য বিষয়ও নয়। বরং আমরা প্রাচ্যবাদ বলতে এর বিশেষায়িত অর্থটা বুঝিয়ে থাকি। যা ইসলামের সাথে সংশ্লিষ্ট ভাষা-সাহিত্য, ইতিহাস-আকীদা, সভ্যতা-সংস্কৃতি ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা করাকে বোঝায়। মুসলিম বিশ্বে যখনই প্রাচ্যতত্ত্ব, প্রাচ্যবাদ, প্রাচ্যবিদ ইত্যাদি শব্দগুলো কোথাও প্রয়োগ করা হয়, তখন মস্তিষ্ক এই বিশেষ অর্থের দিকেই ধাবিত হয়।'[৯]

ড. মাহমুদের এই সমাধানমূলক বক্তব্যের পর মনে হয় এই বিষয়ে আর অতিরিক্ত কোনো কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

অপশ্চিমা ও মুসলিম পণ্ডিত কি প্রাচ্যবিদ হতে পারে?

ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত 'ইসলামী বিশ্বকোষ'-এ মুস্তাশরিকুন শব্দের অধীনে প্রবন্ধকার দাবি করেছেন, 'বর্তমানকালের আঙ্গিকে ইসলামি গবেষণার ক্ষেত্রে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য অথবা অপাশ্চাত্য, উৎসগতভাবে মুসলিম বা অমুসলিম এবং পাশ্চাত্য দেশসমূহে অথবা অন্যত্র কর্মরত ইসলাম ধর্ম, মুসলিম-সমাজসমূহ ও সংস্কৃতি ব্যাপ্তির সকল পক্ষপাতহীন পণ্ডিতের সমন্বয়ে গঠিত গোষ্ঠী নির্দেশ করা হয় বলে অনুধাবন করতে হবে।'[১০]

---

[৮] এর মাঝে আছে আরব্যবিদ (Arabist), ইহুদিবিদ (Hebraist), ভারততাত্ত্বিক (Indologist), মিশরবিদ (Egyptologist), চীনবিদ (Sinologist), জাপানবিদ (Japanologist), ইরানবিদ (Iranologist) ইত্যাদি।

[৯] আল-ইস্তিশরাক ওয়াল খলাফিইয়াতুল ফিকরিইয়া : ১৮, দারুল মাআরিফ প্রকাশনী।

[১০] ইসলামী বিশ্বকোষ : ২০/৪০০। মূল প্রবন্ধ সাধুভাষায় রচিত হওয়ায় কিছুটা পরিমার্জন করা হয়েছে।

এখানে আমরা প্রবন্ধকারের ভাষ্যমতে জানতে পারলাম, প্রাচ্যবিদ হওয়ার জন্য পাশ্চাত্যদেশীয় বা উৎসগতভাবে অমুসলিম হওয়া শর্ত নয়। সুতরাং প্রাচ্যদেশীয় পণ্ডিতকেও প্রাচ্যবিদ বলা যেতে পারে। এমনইভাবে প্রাচ্যবিদদের জ্ঞান-গবেষণা প্রভাবিত মুসলিম পণ্ডিতকেও প্রাচ্যবিদদের কাতারে ফেলা যাবে। কিন্তু এই বক্তব্য প্রামাণিকতার দিক দিয়ে অত্যন্ত দুর্বল এবং অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতের বিরোধী বলেই মনে হয়।[১১] তা ছাড়া এই একাকার-করণের মধ্যে অনেকগুলো সমস্যাও রয়েছে। যার মধ্যে একটা হলো, এর দ্বারা 'প্রভাবক' ও 'প্রভাবিত' এর মধ্যকার পার্থক্য রেখাকে মুছে ফেলা হয়। অথচ এই পার্থক্য রেখার বিদ্যমানতা অত্যন্ত জরুরি।

প্রাচ্যবিদদের জ্ঞান-গবেষণায় প্রভাবিত মুসলিম পণ্ডিতদেরকে প্রাচ্যবিদ আখ্যায়িত করার সমস্যা চিহ্নিত করে বিদগ্ধ লেখক ও গবেষক মুসা আল হাফিজ বলেন, 'মুসলমানদেরকে গুলিয়ে ফেলার এই সাধারণীকরণে আমরা যদি একমত হতে পারতাম, তাহলে মুসলিম দুনিয়ার শত শত চিন্তাবিদকে অরিয়েন্টালিস্ট সাব্যস্ত করতে হতো। এতে পরিভাষাটি স্থানচ্যুত হয়ে যেত এবং প্রভু ও ভৃত্য একাকার হয়ে যেত। অতএব, যে সকল মুসলিম চিন্তাবিদ প্রাচ্যবিদদের মতো বলেন, লেখেন, ভাবেন, তাদেরকে প্রাচ্যবিদ প্রভাবিত বলতে পারি; প্রাচ্যবিদ বলতে পারি না। যদিও এদের অনেকের চিন্তা ও রচনাবলির প্রভাবে মুসলিম জাহানে ঝড়ো বাতাস কম প্রবাহিত হয়নি।'[১২]

মুসা আল হাফিজের পূর্বে আরবের অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের লেখাতেও আমরা এই বক্তব্যের সমর্থন দেখতে পাই। শেষ যুগের বিখ্যাত আরব ইতিহাসবিদ আহমদ হাসান যাইয়াত[১৩] বলেছেন, 'বর্তমানে প্রাচ্যবাদ বলতে বোঝানো হয় পশ্চিমা গোষ্ঠীর প্রাচ্যীয় দেশের ইতিহাস, জাতি, ভাষা-সাহিত্য, জ্ঞানবিজ্ঞান, কৃষ্টি-কালচার, লোকগাঁথা প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা করা।'[১৪]

---

[১১] প্রবন্ধকার ছাড়াও আরও কেউ কেউ এই মত ব্যক্ত করেছেন। যেমন : খ্যাতিমান আরব পণ্ডিত মালিক বিন নবী বলেছেন, 'প্রাচ্যবিদ দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য হলো পশ্চিমা পণ্ডিতবর্গ ছাড়াও বহু আরব পণ্ডিত—যারা ইসলামি চিন্তা ও সংস্কৃতির ওপর তির নিক্ষেপ করেন। যেমন আহমদ হাসান যাইয়াত, মুহাম্মাদ আবদুল গনি, ড. আবদুর রহীম প্রমুখ।' (মুসা আল হাফিজ, প্রাচ্যবিদদের দাঁতের দাগ : ৫৪)

আরবের আরেকজন গবেষক নাজীব আকীকীও এমনটি মনে করতেন। তিনি তার বিখ্যাত প্রাচ্যবিদকোষ 'আল-মুস্তাশরিকুন'-এর মধ্যে কিছু আরব পাদরি এবং প্রাচ্যদেশীয় পণ্ডিতকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

[১২] মুসা আল হাফিজ, প্রাচ্যবিদদের দাঁতের দাগ : ৫২।

[১৩] মজার ব্যাপার হলো, মালিক বিন নবী খোদ আহমদ হাসান যাইয়াতকেও প্রাচ্যবিদ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

[১৪] আহমদ হাসান যাইয়াত, তারীখুল আদাবিল আরাবি : ১২।

এমনইভাবে আরেকজন খ্যাতিমান পণ্ডিত মালিক বিন নবী বলেছেন, 'প্রাচ্যবিদ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেসব পশ্চিমা লেখক, যারা ইসলামের চিন্তা-গবেষণা ও ইসলামি সভ্যতা বিষয়ে লেখালেখি করেন।'[১৫]

এভাবে আরও বহু আরব পণ্ডিত, যারা প্রাচ্যবাদ নিয়ে লেখালেখি করেন, তারা এমন মত ব্যক্ত করেছেন। পাকিস্তানের ইসলামাবাদের ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ডক্টর শরফুদ্দিন ইসলাহী তাঁর 'মুস্তাশরিকীন, ইস্তিশরাক আওর ইসলাম' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন, 'প্রাচ্যদেশীয় অমুসলিমদের ভাষা, জ্ঞানবিজ্ঞান ও ইসলাম ভিন্ন অন্য ধর্মের বিশেষজ্ঞকে প্রাচ্যবিদ বলা যাবে না। চাই তিনি অমুসলিম ও পাশ্চাত্যের কেউ হোক না কেন। সংস্কৃত, হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম বিশেষজ্ঞ পাশ্চাত্য পণ্ডিতকে কেউ প্রাচ্যবিদ বলে অভিহিত করে না। তার মানে বিষয়টা কেমন যেন এমন হলো, প্রাচ্যবিদ বলা হবে পাশ্চাত্যের সেসব অমুসলিমদেরকে; বিশেষ করে ইহুদি-খ্রিষ্টান পণ্ডিতবর্গ, যারা ইসলাম ধর্ম ও এর জ্ঞানবিজ্ঞান, ভাষা-সাহিত্য এবং ইসলাম সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ রাখেন।'[১৬]

ডক্টর শরফুদ্দিন ইসলাহী একেবারে সুস্পষ্ট ভাষায় বিষয়টি তুলে ধরেছেন পাঠকের সামনে। 'প্রাচ্যবিদ' পরিভাষাটি যে জগাখিচুড়ি ধরনের নয়; বরং এর সুনির্দিষ্ট অর্থ ও নির্ধারিত পরিধি রয়েছে—তা তিনি তার এই বক্তব্যে ফুটিয়ে তুলেছেন।

আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিমান আরেকজন বাঙালি গবেষক ড. মোহর আলী, যিনি মুসলিম বিশ্বের নোবেল খ্যাত সৌদির বাদশাহ ফয়সাল পুরস্কার লাভ করেছেন এবং ইংরেজি ভাষায় প্রাচ্যবিদদের জ্ঞান-গবেষণায় উপস্থাপিত আপত্তিজনক কথাবার্তাকে খণ্ডন করে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন, তিনি এই প্রসঙ্গে তাঁর মত ব্যক্ত করেছেন এই বলে, 'প্রাচ্যবিদগণ আল-কুরআনকে আল্লাহর বাণী হিসেবে স্বীকার করে না। তারা যদি এটি বিশ্বাস করে, তাহলে সম্ভবত তারা আর প্রাচ্যবিদ থাকে না।'[১৭]

এই বক্তব্যের মাধ্যমে মূলত কোনো মুসলিমকে প্রাচ্যবিদ বলে আখ্যায়িত করাকে নাকচ করা হচ্ছে। কারণ প্রত্যেক মুসলিমই আল-কুরআনকে আল্লাহর বাণী হিসেবে স্বীকার করে।[১৮]

---

[১৫] মালিক বিন নবী ইনতাজুল মুস্তাশরিকীন : ৫।

[১৬] ইসলাম আওর মুস্তাশরিকীন : ২/৫০, দারুল মুসান্নিফীন, শিবলী একাডেমি, আজমগড়, ভারত।

[১৭] লেখকের রচিত বই 'সীরাতুন নবি এন্ড দ্য অরিয়েন্টালিস্ট' গ্রন্থের অনুবাদ থেকে সংগৃহীত। সীরাত বিশ্বকোষ : ৮/৪০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

[১৮] মিশরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের 'দাওয়াহ ও ইসলামি সংস্কৃতি' বিভাগের প্রধান ড. ইসমাইল আলি মুহাম্মাদের মতে, প্রাচ্যবিদ হওয়ার জন্য অমুসলিম হওয়া নয়, বরং পশ্চিমা হওয়া অত্যাবশ্যক। তাই একজন পশ্চিমা মুসলিম 'প্রাচ্যবিদ' হিসেবে পরিচিতি পেতে পারেন। যদিও

যা-ই হোক, সকলের বক্তব্যকে সামনে রেখে বিবেচনা করলে এই বিষয়টিই জোরালো বলে অনুমিত হয় যে, অপাশ্চাত্য ও ধর্মীয় পরিচয়ে মুসলিম ব্যক্তিরা 'প্রাচ্যবিদ' বলে আখ্যায়িত হতে পারেন না।

ইস্তিশরাক, ইস্তিরাব ও ইস্তিগরাব

ইস্তিশরাক বা প্রাচ্যতত্ত্বের পাশাপাশি আরও দুইটি শব্দ বর্তমান সময়ে বেশ আলোচিত। এই বিষয়ে সামান্য আলোকপাত করে নেওয়া সমীচীন মনে হচ্ছে। যাতে করে এই বিষয়ে আমাদের জানার পরিধিটা সুসংহত ও ত্রুটিমুক্ত হতে পারে।

ইতিপূর্বে আমরা ইস্তিশরাক শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থের ওপরে লম্বা আলোচনা করেছি। সেখানে বিভিন্নজনের উদ্ধৃতি তুলে ধরার মাধ্যমে সর্বশেষ একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছারও চেষ্টা করেছি। এর মাধ্যমে এই শব্দের রূপ-স্বরূপের সাথে আমরা মোটামুটি পরিচিত হতে সক্ষম হয়েছি। তাই এই শব্দ নিয়ে এখানে আর নতুন করে কিছু না বলে আমরা পরবর্তী দুইটি শব্দ নিয়ে আলোচনা করব।

'ইস্তিবার' শব্দটি মূলত আরবি عرب শব্দমূল থেকে উদ্গত। যার শাব্দিক অর্থ আরববিদ হওয়া, আরবদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া এবং নিজেকে তাদের একজন বানিয়ে নেওয়া। আরব সভ্যতা, সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি অধ্যয়ন করা।[১৯]

এই শব্দটি মধ্যযুগে ইউরোপে, বিশেষ করে মুসলিম স্পেনে ব্যাপকতা লাভ করে। তখন মুস্তারিব বলা হতো সেসকল খ্রিষ্টান পণ্ডিতদেরকে, যারা ইসলামি শাসকদের অধীনে বসবাস করত। এদের নিজস্ব সাহিত্যধারা ও শাস্ত্রীয় পরিমণ্ডল ছিল। অনেক সময় আবার শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও দেশব্যাপী অস্থিরতা তৈরির পেছনে এরা মূল ইন্ধন যোগাত। গির্জার অনেক পাদরিরা এসব পণ্ডিতদের উৎসাহ যোগাত এসব অপকর্ম করার জন্য।[২০]

মূলত সেই সময় পুরো ইউরোপ ছিল অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। পশ্চিম ইউরোপের স্পেনে মুসলিম শাসনামলে যখন জ্ঞানচর্চার ফল্গুধারা বইতে শুরু করল, ইউরোপের অন্যান্য দেশেও তখন এর ব্যাপক প্রভাব পড়ল। সেই সময়কার স্পেনের ক্ষমতাসীনরা যেহেতু ছিলেন আরব, তাই চারদিকে আরবীয় কৃষ্টি-কালচার ও সভ্যতা-সংস্কৃতিরই ছিল জয়জয়কার। সীমানা পাড়ি দিয়ে এর প্রভাব গিয়ে পড়ে

প্রাচ্যবিদ্যার সাথে জড়িত অধিকাংশ লোকই পাশ্চাত্যদেশীয় অমুসলিম। (ড. ইসমাইল আলি মুহাম্মাদ, আল-ইস্তিশরাক বাইনাল হাকীকতি ওয়াত তাদ্বলীল : ১৩, দারুল কালিমা প্রকাশনী, ষষ্ঠ প্রকাশ ২০১৪ খ্রি.।)

[১৯] আল-মুজামুল ওয়াসীত : ২/৫৯৮; মিসবাহুল লুগাত : ৫৫৩, থানবী লাইব্রেরী।

[২০] ড. ইয়াহইয়া মুরাদ, রুদূদুন আলা শুবুহাতিল মুস্তাশরিকীন : ৩৫।

ইউরোপের খ্রিষ্টানদের ওপরে। তারা ব্যাপকভাবে আরবদের রীতি-নীতির অনুকরণ শুরু করে। যেমন বর্তমানে আমাদের দেশে ইউরোপীয় কৃষ্টি-কালচার অনুসরণের স্রোত বইছে। শিক্ষালয়ের শিক্ষকেরা তখন ক্লাস নিতেন আরবদের মতো লম্বা কুর্তা গায়ে চাপিয়ে। অন্যান্য ক্ষেত্রেও আরবদের মতো হওয়ার বা সাজার চেষ্টা করা হতো। ইতিহাসে এই যুগটি 'আসরুল ইস্তিরাবিল উরুবি' (عصر الاستعراب الأوربي) বা ইউরোপীয়দের আরব হওয়ার যুগ বলে আখ্যায়িত করা হয়।[২১]

তবে বর্তমান সময়ে সাধারণত ইস্তিরাব দ্বারা বোঝানো হয় অনারব ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক আরবদের জীবনধারা এবং তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট সভ্যতা, ভাষা-সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, ধর্ম ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গবেষণা করা।[২২] এই কারণেই বিশিষ্ট আরবি ভাষাবিদ মুনীর বালাবাক্কী 'মুস্তারিব' এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, 'আরবের মানুষজন, আরব দেশসমূহ অথবা আরবি ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি।'[২৩]

ওপরে উপস্থাপিত তথ্যের আলোকে বলা যায় যে, ইস্তিরাব মূলত ইস্তিশরাকেরই একটি প্রশাখা। অথবা এভাবেও বলতে পারি যে, ইস্তিশরাকের ব্যাপক ও বিশেষ যে দুই ধরনের পরিচয় আমরা ইতিপূর্বে জেনে এসেছি, এর মধ্যে বিশেষ অর্থের ওপরই ইস্তিরাব শব্দটি সফলভাবে প্রয়োগ হয়। তখন উভয়ে একে অপরের সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়।[২৪]

এবার আমরা তৃতীয় শব্দের দিকে দৃষ্টি দেবো। ইস্তিগরাব শব্দটি গঠিত হয়েছে غرب শব্দমূল থেকে। যার অর্থ হলো পশ্চিম, পাশ্চাত্য ইত্যাদি। আর ইস্তিগরাব অর্থ অদ্ভুত মনে করা, বিস্মিত হওয়া ইত্যাদি।

এই শব্দটির প্রাচীন অর্থের সাথে আমাদের আলোচ্য অর্থের কোনো ধরনের সামঞ্জস্যতা নেই। সেজন্যই অভিধান খুললে দেখা যায়, শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হলেও এর কোনোটিই পাশ্চাত্য সম্বন্ধীয় বা পাশ্চাত্য সংক্রান্ত কোনো অর্থ বহন করছে না।

মোটকথা হলো, এখানে ইস্তিশরাকের বিপরীতে এই ইস্তিগরাব শব্দটিকে ব্যবহার করার প্রবণতা খুব বেশি প্রাচীন নয়। কিন্তু তারপরেও যেহেতু অনেকে শব্দটিকে এক নতুন অর্থে ব্যবহার করে নতুন একটি বিষয় বোঝাতে চেষ্টা করে থাকেন, তাই

---

[২১] এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন : আল-হাদারাতুল ইসলামিয়্যাহ, জালাল মাযহার; আসাসু তাকাদ্দুমিল ইলমিইয়িল হাদীস, মারকাযু কুতুবিল শিরক্কিল আওসাত প্রকাশনী।
[২২] ড. ইয়াহইয়া মুরাদ, রুদূদুন আলা শুবুহাতিল মুস্তাশরিকীন : ৩৬।
[২৩] আল মাওরিদ : ৫৮, দারুল ইলম লিল মালায়িন প্রকাশনী, বৈরুত।
[২৪] ড. ইয়াহইয়া মুরাদ, রুদূদুন আলা শুবুহাতিল মুস্তাশরিকীন : ৩৭।

একে একেবারে হেলাফেলা করারও সুযোগ নেই।

এ বিষয়ে ড. মাহমুদের বক্তব্য আমরা লক্ষ করতে পারি। তিনি বলেছেন, 'ইস্তিগরাব শব্দটি যেহেতু غرب শব্দমূল থেকে উদ্ভূত, আর غرب মূলত সূর্যের অস্তাচলকে বোঝায়, সে হিসেবে আমরা বলতে পারি, ইস্তিগরাব মানে হলো প্রাচ্যদেশীয় ব্যক্তিদের পাশ্চাত্যের ভাষা-সাহিত্য ও সভ্যতা-সংস্কৃতির গভীর জ্ঞান অর্জনের প্রচেষ্টা।'[২৫]

এই বিবেচনায় ইস্তিগরাবকে আমরা ইস্তিশরাক-এর বিপরীতমুখী অবস্থা বলে আখ্যায়িত করতে পারি। ডক্টর হাসান হানাফিও সেই কথাই বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'ইস্তিগরাব হলো ইস্তিশরাকের সম্পূর্ণ বিপরীত ও উলটো বিষয়।'[২৬]

তবে এই ইস্তিগরাব বা পাশ্চাত্যচর্চা যেহেতু খুব বেশি হয়নি, সেজন্য অনেকেই এর অস্তিত্ব মেনে নিতে দ্বিধাবোধ করে থাকেন। কারণ তত্ত্বের বিচারে এখন পর্যন্ত এর শক্তিশালী কোনো কাঠামো ও অবয়ব গড়ে ওঠেনি। সেদিকে ইঙ্গিত করেই ড. আহমাদ বলেছেন, 'বাস্তবিকপক্ষে আধুনিক যুগে এসে আরবরা পাশ্চাত্য ও এর সাহিত্য-সভ্যতা নিয়ে খুব মনোযোগী হচ্ছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষার্থীদেরকে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ইন্সটিটিউট ও শিক্ষালয়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করছে। পরবর্তীতে তারা পাশ্চাত্যের বিভিন্ন বই-পুস্তক, গবেষণাপত্র, রচনাবলিকে অনুবাদ করা এবং সেগুলোকে পর্যালোচনা ও প্রকাশ করার কাজ করছে। এতদসত্ত্বেও নিশ্চিত করে কারও জন্য এই কথা বলা কিছুটা কঠিনই বটে যে, ইতোমধ্যে ইস্তিগরাব বা পাশ্চাত্যচর্চা (Occidentalism) নামে আলাদা একটি বিষয়ের জন্ম ঘটেছে। যার সুনির্দিষ্ট কাঠামো, গবেষণা পদ্ধতি, বিদ্যাপীঠ ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং চর্চাকারী গুরু-শিষ্য পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ রয়েছে।'[২৭]

ড. আহমাদের কথা মেনে নিয়েও বলা যায় যে, দিনদিন অবস্থার উন্নতি ঘটছে এবং ইস্তিশরাকের বিপরীতে ইস্তিগরাবের উপস্থিতিটা বেশ জোরদার ও বেগবান হচ্ছে। এর সাম্প্রতিকতম উদাহরণ হলো কাতার ইউনিভার্সিটির কুল্লিয়াতুশ শরীয়াহ ওয়াদদিরাসাতিল ইসলামিয়া (College of Sharia and Islamic studies) ঘোষণা দিয়েছে যে, তারা মাওসুআতুল ইস্তিগরাব বা Encyclopedia of Occidentalism এর কাজে হাত দেবে।[২৮] এই প্রকল্পের অধীনে কাজ করবে প্রায় এক হাজারেরও

[২৫] ফালসাফাতুল ইস্তিগরাব ওয়া আসারুহা ফিল আদাবিল আরাবিইয়িল মুআসির : ৩৭।
[২৬] মুকাদ্দামা ফী ইলমিল ইস্তিগরাব : ২৯।
[২৭] ড. আহমাদ, ফালসাফাতুল ইস্তিশরাক : ৩৫।
[২৮] The Encyclopedia of Occidentalism, the first-ever and largest intellectual project in the Arab and Islamic world that provides a comprehensive

বেশি গবেষক। এটি বিভিন্ন ধরনের চিন্তাগত, জ্ঞানগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও উন্নয়ন-বিষয়ক গবেষণাকর্ম সম্বলিত হবে। এ ছাড়াও আরবের আরও অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইস্তিগরাব নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। জর্ডানের 'আল-মাআহাদুল আলমী লিলফিকরিল ইসলামী' ২০১৪ সালের ৩০ অক্টোবর এই বিষয়ে একটি জমকালো সেমিনারের আয়োজন করেছিল। সে সেমিনারে ইলমুল ইস্তিগরাব বা পাশ্চাত্যবিদ্যা চর্চার রূপরেখা ও বাস্তব নীতিমালা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

এই বিষয়ে অনেক আরব গবেষক নিজেদের প্রচেষ্টা বিলিয়ে যাচ্ছেন। এদের মধ্যে ড. আলি ইবনু ইবরাহীমের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[২৯] কয়েক বছর আগে তিনি 'আদদাওয়াহ ইলা কিয়ামিল ইস্তিগরাব' (পাশ্চাত্যবিদ্যা চর্চার আহ্বান) নামে একটি সেমিনারের আয়োজন করেছেন এবং পাশ্চাত্যতত্ত্বের প্রতি মনোযোগ দেয়ার জন্য গবেষকদেরকে আহ্বান জানিয়েছেন।

তবে এটা স্বীকার্য যে, ইস্তিশরাক বা প্রাচ্যতত্ত্ব দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে যে অবস্থা ও অবস্থান তৈরি করেছে, তার ধারেকাছে পৌঁছতেও ইস্তিগরাব তথা পাশ্চাত্যচর্চাকে আরও লম্বা সময় সফর করতে হবে এবং কষ্ট-ক্লেশ স্বীকার করে কন্টকাকীর্ণ বন্ধুর পথ মাড়ি দিতে হবে।

এখানে আরেকটি বিষয়েও সংক্ষেপে আলোকপাত করে নেয়া সমীচীন মনে হচ্ছে। তা হলো, কেউ কেউ ইস্তিগরাব দ্বারা মুসলিম কর্তৃক প্রাচ্যবিদদের জ্ঞান-গবেষণায় প্রভাবিত হওয়া ও তাদের মানসসন্তান হয়ে যাওয়াকে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ ইতিপূর্বে আমরা যেমন 'আরব' শব্দ থেকে গঠিত ইস্তিরাব মানে আরবদের চিন্তা-গবেষণা ও কৃষ্টি-কালচার দ্বারা প্রভাবিত হওয়াকে বুঝিয়েছি, তেমনই তারা গরব (পশ্চিম) শব্দ থেকে গঠিত ইস্তিগরাব দ্বারা বুঝিয়েছেন পাশ্চাত্যের চিন্তা-গবেষণা ও কৃষ্টি-কালচার দ্বারা প্রভাবিত হওয়া।[৩০]

---

understanding of the wests culture, ideology, history, religion and politics, was inaugurated today during a ceremony in the Diplomatic Club. [Encyclopedia of Occidentalism Inaugurated, 23 May 2022, Ministry of Foreign Affairs Qatar News.]

[২৯] ড. আলি ইবনু ইবরাহীম আন-নামলাহ সৌদি আরবের আল-কাসিম প্রদেশের বাসিন্দা। ১৯৫২ সালে তাঁর জন্ম। কিছুকাল সৌদি আরবের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে (Ministry of Human Resources and Social Development) চাকরি করেছেন। বর্তমানে রিয়াদের কিং সৌদ ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপক হিসেবে আছেন।

[৩০] পাকিস্তানের বিখ্যাত আলিম ইদরীস মিরাঠী ﵀-এর রচিত 'সুন্নত কা তাশরীকী মাকাম' গ্রন্থ পড়তে গিয়ে বিষয়টি আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। সেখানে তিনি ডক্টর ফজলুর রহমান নামক জনৈক ব্যক্তিকে মুস্তাগরিব ও বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ শাখতের 'রুহানী সাগরেদ' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। (সুন্নত কা তাশরীকী মাকাম : ৩৪)

তবে এই অর্থে শব্দটির তেমন একটা প্রচলন হয়নি; বরং ওপরে আমরা যে অর্থে শব্দটির আলোচনা করেছি, সেই অর্থেই এটি ব্যাপক প্রসিদ্ধ ও পরিচিত। প্রাচ্যের ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক পাশ্চাত্যের ভাষা-সাহিত্য ও সভ্যতা-সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা বিষয়ে যারা গ্রন্থ রচনা করেছেন, তারাও এর জন্য 'ইস্তিগরাব' শব্দটিকেই বেছে নিয়েছেন। যেমন ডক্টর হাসান হানাফি রচিত 'মুকাদ্দামাহ ফী ইলমিল ইস্তিগরাব' ও ডক্টর আলি ইবনু ইবরাহীম রচিত 'আল ইসতিগরাব : আল মানহাজ ফী ফাহমিনা আল গারব' বই দুটি এ ক্ষেত্রে উদাহরণস্বরূপ পেশ করা যেতে পারে।[৩১]

পরবর্তীতে পাকিস্তানের ভাওয়ালপুরের ইসলামিয়া ইউনিভার্সিটির পিএইচডি স্কলার হাফেজ সাইফুল ইসলামের লেখা 'তাহরীকে ইস্তিশরাক কী হাকিকত আওর ইস্তিশরাকী লিটরেচার কে আসারাত' বইয়ের মধ্যেও (৫০ নং পৃষ্ঠায়) ইস্তিগরাব শব্দটিকে এই অর্থে ব্যবহার করতে দেখেছি।

[৩১] এই বিষয়ে গ্রন্থ দুটিতে বিশদ আলোচনা রয়েছে। বিশেষত হাসান হানাফির গ্রন্থটি অনেক তথ্যবহুল। আগ্রহী পাঠক বই দুটি দেখতে পারেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাচ্যবিদদের আদি পুরুষ

ইসলাম ও মুসলিমদের সাথে সম্মুখসমরে কুলিয়ে উঠতে না পেরে ইসলামি জ্ঞানবিজ্ঞানকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বানানোর কৌশলটা আদিকাল থেকেই ইসলামের শত্রুপক্ষ অবলম্বন করে আসছে। পার্থক্য ছিল শুধু তার ধরন-বরনে এবং গতিপ্রকৃতিতে।

ইসলামের শুরুর দিকে যখন বিশ্বজুড়ে ছিল মুসলিমদের জয়জয়কার, তাদের সামনে মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়েছিল তৎকালীন বিশ্বের দুই পরাশক্তি—রোম ও পারস্য; তখনো দেখা যায়, একদল লোক ভালোমানুষির পোশাক গায়ে চাপিয়ে মুসলিমদের জ্ঞান-ভাণ্ডারকে কলুষিত করতে চেয়েছে আবর্জনার মিশ্রণ ঘটিয়ে।

বিখ্যাত হাদীসশাস্ত্রবিদ ইমাম ইবনু হিব্বান রাহ. তাদের পরিচয় তুলে ধরেছেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'কিতাবুল মাজরূহীন'-এর মধ্যে। সেখানে তিনি তাদেরকে যিন্দিকশ্রেণি বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর ভাষাতেই পড়া যাক—

'যিন্দিক হলো সেসকল লোক, যারা তলে তলে কুফরি আকীদা ও ধর্মহীনতার বিশ্বাস লালন করত। আল্লাহ ও পরকালের প্রতি তাদের কোনো বিশ্বাস ছিল না। এরা উলামায়ে কিরামের বেশভূষা ধারণ করে বিভিন্ন শহরে প্রবেশ করত এবং আলিমদের নামে মনগড়া হাদীস তৈরি করে তাদের সূত্রে সেগুলো বর্ণনা করত। যাতে করে এর মাধ্যমে সাধারণ মুসলিমদের মনে নানা রকম সংশয়-সন্দেহের বীজ বপন করে দেওয়া যায়। পরবর্তীতে তাদের থেকে অনেক নির্ভরযোগ্য হাদীসবর্ণনাকারী এসব শুনে তাদের ছাত্রদের কাছে তা বর্ণনা করতেন। এভাবেই এসব বানোয়াট হাদীস মানুষের হাতে হাতে পৌঁছে যায় এবং সবার মাঝে তা ছড়িয়ে পড়ে।'[৩২]

তৃতীয় আব্বাসী খলিফা মাহদী বলেছেন, 'আমার কাছে একজন যিন্দিক স্বীকার করেছে যে, সে চারশত হাদীস তৈরি করেছে। সেগুলো এখন মানুষের মধ্যে প্রচারিত হচ্ছে।'[৩৩]

মূলত মুসলিমদের জ্ঞানতথ্যের অন্যতম প্রধান উৎস হাদীসকে এই সকল লোক নানাভাবে আক্রমণ করার চেষ্টা করেছে। এর মধ্যে দুর্গন্ধময় ময়লা আবর্জনা মিশিয়ে

---

[৩২] ইবনু হিব্বান, কিতাবুল মাজরূহীন : ১/৫৮।
[৩৩] ইবনুল জাওযী, আল-মাওযুয়াত : ১/১৫।

একে অকার্যকর ও অনির্ভরযোগ্য করে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানিতে তিনি এদেরকে প্রতিহত করার জন্য সর্বযুগেই যোগ্য ব্যক্তিদের একটি শ্রেণি তৈরি করে দিয়েছেন। তাঁরা নিজেদের জীবন-যৌবন আর সময়-শ্রমের নজরানা পেশ করে এসব কুচক্রী লোকদের হাত থেকে হাদীসশাস্ত্রকে হিফাজত করেছেন।[৩৪]

এই শ্রেণির লোকগুলোকেই আমরা প্রাচ্যবিদদের আদি পুরুষ বলে আখ্যায়িত করতে পারি। এদের আদর্শ অনুসরণ করেই পরবর্তীতে প্রাচ্যবিদরা তাদের কর্মপন্থার দিশা ঠিক করেছিল। সুতরাং একথা সহজেই বলা যায় যে, বর্তমান সময়ের যে ইস্তিশরাক বা প্রাচ্যবাদের দেখা আমরা পাচ্ছি, তার আদর্শ-ভিত্তি রচিত হয়েছিল বহু আগে। তারপর সময়ের পরিক্রমার ভেতর দিয়ে একসময় এটি জ্ঞানগত আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে একটি স্বতন্ত্র বিদ্যা হিসেবে অস্তিত্ব লাভ করে।

প্রাচ্যবাদচর্চার প্রারম্ভকাল

পশ্চিমা পণ্ডিতগণ ঠিক কবে থেকে প্রাচ্যের, বিশেষ করে আরব ভূখণ্ডের মুসলিমদের জ্ঞানবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা শুরু করে, তার সুনির্দিষ্ট দিন-তারিখ উল্লেখ করা সম্ভব নয়। কারণ এই ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক ও জ্ঞানগত আন্দোলন দিনক্ষণ ঠিক করে শুরু হয় না; বরং সময়ের পরিক্রমার ভেতর দিয়ে নানানজনের হাত হয়ে তা ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে।

এই প্রসঙ্গে মুস্তফা সিবাঈর বক্তব্য হলো, 'ইতিহাস এ ক্ষেত্রে নীরব যে, ঠিক কবে কোন ইউরোপীয় প্রাচ্যদেশীয় জ্ঞান-বিদ্যার ওপর মনোযোগ নিবদ্ধ করেছিল। যার কারণে সঠিক দিন-তারিখ নিশ্চয়তার সাথে বলার সুযোগ নেই। তবে একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, যখন মুসলিম অধ্যুষিত স্পেনের সোনালি সময় চলছিল, তখন সেখানকার বিদ্যাপীঠগুলোতে পশ্চিমা পাদরিরাও পড়তে আসত। এদের মাধ্যমেই বিভিন্ন আরবিগ্রন্থ, বিশেষ করে কুরআনুল কারীম বিভিন্ন পশ্চিমা ভাষায় অনূদিত হয়। তারা বিদগ্ধ মুসলিম আলিমদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। যার মধ্যে অন্যতম হলো দর্শন, চিকিৎসা ও গণিতশাস্ত্র।'[৩৫]

তবে গবেষকগণ এই বিষয়ে একমত যে, প্রাচ্যবাদের আনুষ্ঠানিক পথচলা শুরু হয় ১৩১২ খ্রিষ্টাব্দে; 'কাউন্সিল অব ভিয়েনা' (The Council Of Vienna) এর

[৩৪] কীভাবে উম্মতের আলিমগণ বানোয়াট বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসগুলোকে সঠিকভাবে হিফাজত করেছেন, তার সবিস্তার বিবরণ জানতে দেখুন ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহ.-এর লেখা 'হাদীসের নামে জালিয়াতি' বইটির ৮০-১৩৩ পৃষ্ঠা।
[৩৫] মুস্তফা সিবাঈ, আল-ইস্তিশরাক ওয়াল মুস্তাশরিকুন : ১৭।

একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে। এই বিষয়ে সামনে আমরা সবিস্তারে আলোচনা করব। প্রাচ্যবাদের এই আনুষ্ঠানিক পথচলার স্বীকৃতি ইঙ্গিত বহন করে যে, এর পূর্বে অ-আনুষ্ঠানিকভাবে প্রাচ্যবাদের চর্চা অব্যাহতভাবে চলে আসছিল। এর প্রারম্ভকাল নিয়ে আরব গবেষক মাজদী মুহাম্মাদ তিনটি মত ব্যক্ত করেছেন। সেগুলো হলো—

ক. ইউরোপে প্রাচ্যবাদচর্চার ধারা শুরু হয় এগারো শতকের শুরুর দিকে।

খ. অনেক গবেষক মনে করেন, ইউরোপে ইসলাম ও আরবি-বিষয়ক পড়াশোনার সূচনা হয় দ্বাদশ শতাব্দীতে। কারণ এই শতকেই প্রথমবারের মতো ল্যাটিন ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ সমাপ্ত হয়েছিল।

গ. কোনো কোনো গবেষকের মতে, পূর্বোক্ত দুই যুগের আরও আগে তথা দশম খ্রিষ্টাব্দেই প্রাচ্যবাদের চর্চা শুরু হয় ইউরোপে।[৩৬]

এই তিন মতের বাইরেও আরও অনেকগুলো মত পাওয়া যায়। যেমন : একদল মনীষীর মতে, প্রাচ্যবিদদের এই সমস্ত কাজ ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে নেপোলিয়নের মিশর আক্রমণের পর থেকে শুরু হয়। নেপোলিয়নের মিশর আগ্রাসনের সময় তার সাথে ছিল বড় বড় খ্রিষ্টান মিশনারি পাদরি। এদের মধ্যে আরবি ভাষার সাহিত্যিকও ছিল অনেক। তারা কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও বিভিন্ন জ্ঞানের বই-পুস্তক অনুবাদের কাজে নিয়োজিত ছিল।[৩৭]

প্রাচ্যবাদের চর্চা শুরুর সময়টা নির্দেশ করতে যারা সপ্তদশ শতাব্দী বা তারও পরের কথা বলেছেন, তাদের এমন মত প্রদানের পেছনে যে কারণটি বিদ্যমান বলে অনুমিত হয়—তা হলো, 'প্রাচ্যবাদ' পরিভাষাটি ইউরোপে অস্তিত্ব লাভ করেছে সপ্তদশ শতাব্দীতে। অথচ এটি তো জানা কথাই যে, পরিভাষা অস্তিত্ব লাভ করার কারণে কোনো শাস্ত্র জন্ম নেয় না; বরং কোনো একটি শাস্ত্রের জন্ম হলে তখন সেটাকে ব্যক্ত করার জন্য পরিভাষার দরকার পড়ে। সে হিসেবে সপ্তদশ শতাব্দীতে 'প্রাচ্যবাদ' পরিভাষাটি ইউরোপে অস্তিত্ব লাভ করলেও মূল বিষয়টি যে আগে থেকেই বিদ্যমান—তা সহজেই অনুমেয়।

যা-ই হোক, মতামতের ক্ষেত্রে এমন বিভিন্নতা সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। যেহেতু আমরা আগেই বলেছিলাম যে, এটি দিনক্ষণ নির্দিষ্ট করে গড়ে ওঠেনি; বরং সময়ের পরিক্রমার ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে অস্তিত্বলাভ করেছে।

---

[৩৬] মাজদী মুহাম্মাদ, মাওকিফুল মুস্তাশরিকীন ফিস সাহওয়াতিল ইসলামিয়্যা : ১৮, দারুর রওদাহ, কায়রো।

[৩৭] বদরুল বিন হারুন, প্রাচ্যবিদদের ইসলাম চর্চা ও বিকৃতির অপপ্রয়াস : ০৯, দারুল ইবতিকার, ফকিরাপুল, ঢাকা, প্রকাশকাল ২০০৪ খ্রি.।

প্রাচ্যবাদের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

আমরা ইতিপূর্বে জেনে এসেছি যে, প্রাচ্যবাদ খুব ধীরে ধীরে, দীর্ঘ সময় নিয়ে ক্রমান্বয়ে রয়েসয়ে বেড়ে উঠেছে। হুট করেই এর উদ্ভব হয়নি। এবং সময়ের তালে তালে এর রং-রূপে ও স্বভাব-বৈচিত্রে সাধিত হয়েছে নানা পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের হাত ধরে প্রাচ্যবাদের কর্মক্ষেত্রে ও প্রকৃতি-চরিত্রে এসেছে নতুনত্ব ও বিভিন্নতা। ইতিহাসে এর উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ধারাবাহিক চিত্রটা এখন আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করব।

পাঠকের সহজে বোধগম্য হওয়ার সুবিধার্থে প্রাচ্যবাদের ক্রমবিকাশের ধারাটাকে আমরা আলাদা আলাদা কয়েকটি যুগে বিভক্ত করব। প্রতি যুগে প্রাচ্যবাদের ধরন এবং তার পরবর্তী যুগে এর মাঝে আসা নতুনত্ব ও ভিন্নতাগুলোও মোটামুটিভাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

প্রাচ্যবাদচর্চার প্রথম যুগ

প্রাচ্যবাদের আদর্শিক ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল বহু পূর্বে। ইসলামের একেবারে শুরুর যুগে। তা আমরা ইতিপূর্বে জেনে এসেছি। এই আদর্শিক ভিত্তি প্রাচ্যবাদকে 'তত্ত্ব' হিসেবে দাঁড় করাতে বেশ সহায়তা করেছে। তারপরে এর জ্ঞানগত ভিত্তিটা পাকাপোক্ত হয় মুসলিম স্পেনে। ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে তারিক বিন যিয়াদের হাত ধরে স্পেনের মাটি মুসলিম মুজাহিদদের পদানত হওয়ার মাধ্যমে মুসলিমদের ইউরোপ বিজয়ের সূচনা হয়। স্পেন বিজয় শুধুমাত্র একটা দেশ বা একটা ভুখণ্ড বিজয় ছিল না। বরং এর মধ্য দিয়ে নতুন করে এক তাহযীব-তামাদ্দুন ও জ্ঞানবিজ্ঞানের দ্বার উন্মোচিত হয়েছিল। এই বিজয় পশ্চিমা লোকদের মন-মানসে ইসলাম সম্পর্কে জানার ও বিভিন্ন ইসলামি জ্ঞান-বিদ্যার সাথে পরিচিত হওয়ার আগ্রহকে ব্যাপকভাবে চাঙ্গা করেছিল।

সে সময় মুসলিম স্পেন হয়ে ওঠে ইউরোপের সবচেয়ে সমৃদ্ধ অঞ্চল। জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিল্প-সাহিত্যে, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে স্পেন ছিল অনন্য ও অতুলনীয়। স্পেনের নগর সভ্যতা কতটা উন্নত ছিল—তা বোঝার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, এক কর্ডোভা শহরেই দুই লক্ষাধিক অট্টালিকা শোভা পেত। প্রস্তর নির্মিত বাসভবন, মর্মর প্রস্রবণ, প্রস্ফুটিত পুষ্পোদ্যান, বড় বড় পান্থশালা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, বিশালাকার প্রাসাদসমূহ, জামে মসজিদ-সহ অসংখ্য মসজিদ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সড়ক, সেতু ইত্যাদি কর্ডোভাকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগরীতে রূপান্তরিত করেছিল। এই নগরীতে ৮৪০০০ বিপণীকেন্দ্র, ৩৮০০০ মসজিদ ও ৯০০ স্নানাগার ছিল। এগুলো জনসাধারণের নিত্যপ্রয়োজন ও ধর্মীয় প্রয়োজন মেটাত। চিকিৎসাব্যবস্থা এতই

উন্নত ছিল যে, কর্ডোভাতেই ৫০টি হাসপাতাল ছিল। এ ছাড়া গ্রানাডা, সেভিল এবং অন্যান্য শহরেও হাসপাতাল নির্মিত হয়।[৩৮]

স্পেনের এই নগর সভ্যতার পাশে যদি আমরা তৎকালীন ইউরোপের অবস্থাকে দাঁড় করিয়ে নিরীক্ষণ করি, তবে দুই জগতের অবস্থার একটি তুলনামূলক চিত্র খুঁজে পাব। ইংরেজ ঐতিহাসিক ড্রেপারের ভাষাতেই দেখি, তাহলে কথাগুলো বেশি বিশ্বাসযোগ্য হবে—

'ইউরোপীয়রা তখন বর্বর বন্য অবস্থা ছাড়িয়ে ওঠেনি বলা চলে। তাদের দেহ অপরিচ্ছন্ন, হৃদয় তিমিরাচ্ছন্ন ছিল। হীন ধর্মতাত্ত্বিক মর্যাদাশূন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী পাদরিরা ক্ষমতার জন্য বিবাদে মত্ত ছিল। অধিবাসীরা পর্ণকুটিরে বাস করত। মেঝে নলখাগড়ায় ঢেকে দেওয়ালে খড়ের মাদুর টাঙিয়ে রাখতে পারলেই ঐশ্বর্যের চিহ্ন বলে বিবেচিত হতো। সিম, কলাই, বৃক্ষমূল, এমনকি ছাল খেয়ে অতিকষ্টে জীবন ধারণ করত। এর সাথে একখানা গো-যান থাকলেই রাজার আড়ম্বর পর্যাপ্ত পরিমাণে ও সন্তোষজনক রূপে প্রকাশ পেত।'[৩৯]

নগর সভ্যতার পাশাপাশি জ্ঞানগত দিক দিয়েও তৎকালীন ইউরোপ মুসলিম স্পেনের ধারেকাছেও ছিল না। স্পেন যখন মুসলিমদের হাত ধরে জ্ঞানের জ্যোতিতে ভাস্বর, উন্নত সভ্যতা-সংস্কৃতি আর জীবনাচারের আলোয় আলোকিত, তখনো সমগ্র ইউরোপ জুড়ে ছিল অজ্ঞতা আর মূর্খতার নিকষ কালো অন্ধকার। অসভ্যতার খোলস ছেড়ে সভ্যতার সীমানায় প্রবেশ করার মতো সৌভাগ্য তখনো তাদের হয়ে ওঠেনি। এই সৌভাগ্য অর্জন করার জন্য তাদেরকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল আরও লম্বা অনেকটা সময়।

যখন মুসলিম পণ্ডিতগণ তাঁদের বিদ্যাপীঠে পৃথিবীর প্রদক্ষিণ করা ও গোলাকার হওয়া এবং সৌরজগতের নানা পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করতেন, তখন ইউরোপের লোকেরা বিভিন্ন কুসংস্কার আর গালগল্পের বিশ্বাসে ছিল মত্ত। তাদের কেউ কখনো স্পেন ভ্রমণে এলে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত। মুগ্ধতার আবেশে শুনত সেখানকার মুসলিম পণ্ডিতদের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা।[৪০]

মুসলিমদের এমন উন্নতি-অগ্রগতির চোখ ধাঁধানো ঝলকে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ঝাঁকেঝাঁকে লোকজন আসতে থাকে এখানে। মুসলিম মনীষীদের কাছে তারা পাঠ নেয় জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার।

[৩৮] এম. এ. কাদের, মূর সভ্যতা : ০৩; ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনের মুসলমানদের ইতিহাস : ২৮৩।
[৩৯] J.W. Draper, Intellectual Development in Europe, Vol. 11, p. 25-30.
[৪০] মুস্তফা সিবাঈ, মিন রওয়ায়িই হাযারতিনা : ৮১-৮২।

পশ্চিমা গবেষক স্ট্যানলি লেনপুল (Stanley Lane poole ১৮৫৪-১৯৩১) খুব সুন্দরভাবে বিষয়টি ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি বলেন, 'শিল্পকলা, সাহিত্য ও বিজ্ঞান মুসলিম স্পেনে যেরূপ উৎকর্ষতা লাভ করেছিল, এরূপ ইউরোপের অন্য কোথাও পরিলক্ষিত হয়নি। শিক্ষার্থীগণ ফ্রান্স, জার্মানি, ব্রিটেন থেকে দলে দলে ম্যূরদের শহরগুলোতে ভিড় জমাত জ্ঞানার্জনের জন্য। স্পেনের শল্যচিকিৎসক ও ডাক্তারগণ বিজ্ঞানচর্চায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এমনকি মহিলাদের উচ্চশিক্ষার জন্য অনুপ্রাণিত করা হতো এবং কর্ডোভার অধিবাসীদের মধ্যে মহিলা চিকিৎসকের অভাব ছিল না। একমাত্র স্পেনেই অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, ইতিহাস, দর্শন ও আইনশাস্ত্র বিষয়ে শিক্ষাদান করা হতো। সংক্ষেপে বলতে গেলে, যা দ্বারা সাম্রাজ্য মহান ও সর্বাঙ্গীন উন্নত হয় এবং যা দ্বারা পরিমার্জিত রুচি ও সভ্যতার পথ সুগম হয়, তার সবকিছুই মুসলিম স্পেনে পাওয়া যেত। বহু শতাব্দী ধরে স্পেন শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে চর্চা ও সাধনার জন্য সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র ছিল। সেজন্য ইউরোপের অন্য কোনো দেশ ম্যূরদের জ্ঞানপিপাসার চারণভূমির সমতুল্য হতে পারেনি।'[৪১]

স্পেনে আগমনকারী ইউরোপীয় খ্রিষ্টান শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জনের পাশাপাশি আরবি ভাষা ও সাহিত্যেও দক্ষতা অর্জন করত। এ ছাড়া তাদের উপায়ও ছিল না। কারণ মুসলিম পণ্ডিতগণ তাঁদের পাঠশালায় আরবি ভাষাতেই পাঠদান করতেন এবং এই ভাষাতেই তাঁদের যাবতীয় গবেষণা ও রচনাবলি লিপিবদ্ধ করতেন। এই ভাষাই ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানে নেতৃত্বদানকারী ভাষা।

এসব শিক্ষার্থীরা শিক্ষাগ্রহণ শেষে দেশে ফিরে যাওয়ার সময় প্রচুর পরিমাণে বইপত্র নিজেদের সাথে করে নিয়ে যেত। পরে সেগুলো ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করে ইউরোপের লোকদের জ্ঞানচর্চার পথকে সুগম করার চেষ্টা করত। ব্যক্তি উদ্যোগে এমন প্রচুর গ্রন্থ আরবি থেকে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয় এবং ইউরোপের বিভিন্ন শিক্ষালয়ে তা পাঠ্যবই হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়।

এই প্রসঙ্গে মুস্তফা সিবাঈ রাহ. এর বক্তব্যটা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'পাদরিরা (স্পেন থেকে জ্ঞান অর্জন করে) স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করার পর সেখানে আরবদের শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও প্রথিতযশা আলিমদের রচনাবলি ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে দেয়। এমনকি তারা আরবিভাষায় লিখিত বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য দেশজুড়ে অসংখ্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। এমনই একটি মাদরাসার নাম ছিল বাদাবী। গির্জাগুলোতে বা পাদরিদের প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাগুলোতে আরবি থেকে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত বই পড়ানো হতো। ওই

[৪১] Stanley Lane poole, The Story of the Moors in Spain : 01.

সময় ল্যাটিন ভাষা গোটা ইউরোপে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা করার ভাষা হিসেবে বিবেচিত হতো। পশ্চিমা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো প্রায় ছয়শ বছর আরবদের রচনাবলির ওপর নির্ভরশীল ছিল। পঠন ও পাঠদানের ক্ষেত্রে তারা আরবদের বইগুলোকেই উৎসগ্রন্থ বিবেচনা করত।'[৪২]

টলেডো অনুবাদক সমিতি (Toledo School of Translators)

তৎকালীন মুসলিম স্পেন ছিল বড় বড় অনেকগুলো ভূখণ্ডের সমষ্টি। এমনই একটি ভূখণ্ড ছিল টলেডো নগরী। জ্ঞানবিজ্ঞানে আর উন্নতি-উৎকর্ষতায় এটি ছিল স্পেনের অন্যতম নামকরা নগরী। কিন্তু সময়ের পালাবদলে মুসলিমরা যখন ডুবে গিয়েছিল ভোগবিলাস আর চিত্তবিনোদনের সরোবরে; ভুলে গিয়েছিল তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং পূর্বপুরুষদের ত্যাগ-তিতিক্ষার রক্তঝরা ইতিহাস, তখনই তাদের ওপর নেমে এসেছিল বিপদের বিক্ষুব্ধ ঝড়-ঝাপটা।

মুসলিমদের দুর্বলতার সুযোগকে লুফে নিয়ে খ্রিষ্টানরা আক্রমণ করে বসে টলেডোকে। ১০৮৫ খ্রিষ্টাব্দে তাদের আক্রমণের মুখে এই সমৃদ্ধ নগরীটি মুসলিমদের হাতছাড়া হয়ে চলে যায় খ্রিষ্টানদের কবজায়। তারা এই নগরীকে রোমান চার্চের প্রধান প্রাতিষ্ঠানিক কেন্দ্ররূপে নির্বাচিত করে।

১১৩৬ খ্রিষ্টাব্দে স্পেন থেকে শিক্ষা অর্জন করা একজন পণ্ডিতের হাত ধরে টলেডোতে ইসলামি বইপত্র আরবি থেকে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাতার নাম ছিল রেমন্ড (Raymond)। টলেডোতে আরবি গ্রন্থ অনুবাদের যে জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল দ্বাদশ শতকে, তার মূল নায়ক ছিলেন তিনি।

টলেডোতে অবস্থিত খ্রিষ্টানদের একটি ক্যাথেড্রালের লাইব্রেরিতে অনুবাদে দক্ষ একটি দলকে সাথে করে তিনি আরবি গ্রন্থসমূহ ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করার কার্যক্রম শুরু করেন। এটি ছিল তৎকালীন গির্জাগুলোর অফিসিয়াল ভাষা এবং ইউরোপে এই ভাষাতেই সেসময় জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা হতো।

এই অনুবাদক দলের কয়েকজন তৎকালে বেশ সুনাম কুড়িয়েছিলেন এবং আপন আপন দক্ষতা ও কর্মতৎপরতার বলে লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে দুজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

---

[৪২] মুস্তফা সিবাঈ, আল-ইস্তিশরাক ওয়াল মুস্তাশরিকুন : ১৮। চলমান আলোচনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ডা. শামসুল আরেফীন রচিত 'কাঠগড়া' বইটি দ্রষ্টব্য।

এক. জেরার্ড অব ক্রেমনা

জেরার্ড অব ক্রেমনা (Gerard of Cremona) ছিলেন মূলত ইতালিয়ান নাগরিক। উত্তর ইতালির কোনো এক গ্রামে তার জন্ম। ১১৬৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি তৎকালীন জ্ঞানচর্চার তীর্থভূমি স্পেনের টলেডো নগরীতে আগমন করেন এবং সেখানেই আরবি ভাষা শেখেন। প্রাচ্যবিদ আর্চবিশপ রেমন্ড কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অনুবাদক সমিতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদক হিসেবে গণ্য করা হয় তাকে। তার অনুবাদ করা গ্রন্থের সংখ্যা ৮৭টির চেয়েও বেশি।[৪৩]

দুই. ইউহান্না ইশবিলী

ইউহান্না ইশবিলীকে (Jhon of Seville) অনেকে টলেডো অনুবাদক সমিতির প্রধান অনুবাদক বলেও আখ্যায়িত করেন। তিনি ছিলেন ইহুদি ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টান। মূলত আরবি ভাষায় লিখিত দর্শন ও ডাক্তারিবিদ্যা-বিষয়ক গ্রন্থগুলোকে অনুবাদ করতেন তিনি। তার অনুবাদ করা গ্রন্থগুলোর মধ্যে বিখ্যাত হলো আল-ফারগানী রচিত 'উসূলু ইলমিন নুজুম' গ্রন্থটি। ১১৩৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি এর অনুবাদ সম্পন্ন করেন এবং এর ফলে ব্যাপক সুনাম অর্জন করেন।[৪৪]

এই দুইজন ছাড়াও আরও বেশ কয়েকজন দক্ষ অনুবাদক ছিলেন টলেডোর এই অনুবাদক সমিতির সদস্য। এই সমিতির সদস্যদের বাইরে স্পেন থেকে পড়াশোনা করা আরও অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছিলেন অনুবাদকর্মে। তারা নিজেদের দক্ষতা ও শ্রমকে কাজে লাগিয়ে মুসলিম বিদ্বান ও বিজ্ঞানীদের জ্ঞানবিজ্ঞান-বিষয়ক রচনাবলির সাথে ইউরোপবাসীদেরকে পরিচিত করিয়ে দিতে থাকেন। তাদের হাত ধরেই ইউরোপে প্রবেশ করতে থাকে মুসলিমদের জ্ঞান-গবেষণা। এভাবে ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে মুসলিমদের জ্ঞান-গবেষণার বিষয়ে জানার আগ্রহ প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠতে থাকে।

ক্রুসেড যুদ্ধের প্রত্যক্ষ দাবানল নির্বাপিত হওয়া পর্যন্ত এই যুগটা বহাল ছিল বলা যেতে পারে। এই সময়ে পশ্চিমা পণ্ডিতগণ তথা প্রাচ্যবিদদের জ্ঞান-গবেষণা ও অনুবাদকর্ম ছিল অনেকটাই বিদ্বেষমুক্ত ও খালেস জ্ঞানচর্চার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। মুসলিমদের জ্ঞান-গবেষণার প্রতি ছিল তখন তাদের মূল আগ্রহ। ধর্মীয় বিষয়াদি নিয়ে তারা খুব বেশি আগ্রহী ও মনোযোগী ছিল না এই সময়টাতে। ফলে দেখা যায়, এই সময়টাতে যতগুলো গ্রন্থ আরবি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে, তার প্রায় সবগুলোই

---

[৪৩] Renaissance of the twelfth Century : 287.

[৪৪] বাদাবী, মাওসুআতুল মুস্তাশরিকীন : ৬৩১, দারুল ইলম লিল-মালায়ীন প্রকাশনী, তৃতীয় সংস্করণ; History of Civilization of Central Asia : 4/2.

জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন, চিকিৎসাশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে লিখিত ছিল। সেখানে ধর্মীয় গ্রন্থের সংখ্যা ছিল একেবারেই নগণ্য।

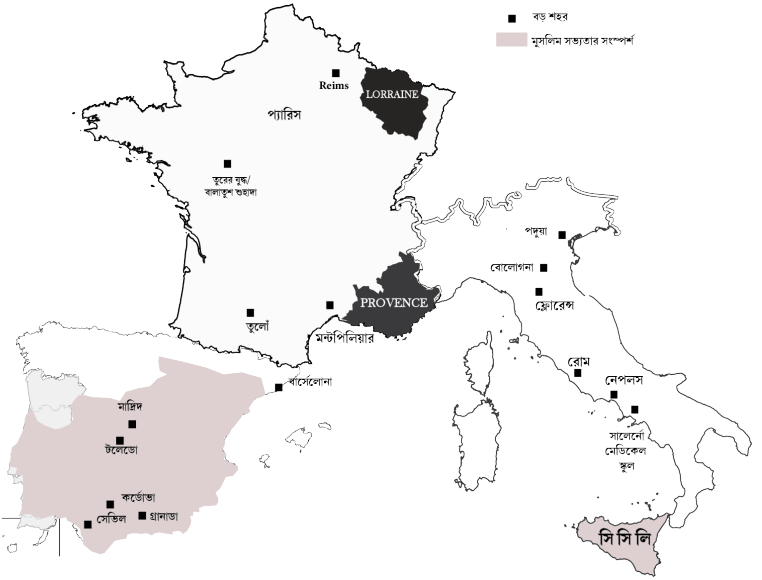

আস্তে আস্তে পাশ্চাত্য ঘুম থেকে জেগে উঠতে থাকে এবং অন্ধকারকে পায়ে ঠেলে আলোর ভুবনে প্রবেশ করতে শুরু করে। ইউরোপের ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখি যে, ষষ্ঠ থেকে দশম খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়টাকে অন্ধকার যুগ বা Dark ages বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। ইউরোপের অন্ধকার থেকে মুক্তি পাওয়ার পেছনে এই যুগের ইতিহাস খুব কার্যকরী ভূমিকা রেখেছিল এবং প্রাচ্যবাদকে মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। যার মাধ্যমে প্রাচ্যবাদ অ-আনুষ্ঠানিকতার পাট চুকিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করতে সক্ষম হয়েছিল।[৪৫]

প্রাচ্যবাদচর্চার দ্বিতীয় যুগ

প্রাচ্যবাদচর্চার দ্বিতীয় যুগের সূচনা হয়েছিল ক্রুসেড যুদ্ধের প্রত্যক্ষ পরিসমাপ্তির

---

[৪৫] কাতারের NORTHWESTERN UNIVERSITY থেকে প্রকাশিত 'The Western University and The Arab Tradition : A Secret History' বইতে একটি অধ্যায় আছে—যার শিরোনাম হলো Knowledge Transfer : from East to West। এখানে প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যে জ্ঞানবিজ্ঞান কীভাবে অনূদিত হয়ে পাচার হলো, সেই বিষয়ে বেশ চমৎকার আলোচনা আছে। আগ্রহী পাঠক দেখে নিতে পারেন। বইটির পিডিএফ অনলাইনে সহজলভ্য। এ ছাড়াও ড. ফাতিমা হুদা রচিত 'নূরুল ইসলাম ওয়া আবাতীলুল ইস্তিশরাক' বইতেও (৩১-৩৬ পৃষ্ঠা) এই বিষয়ে খুব দারুণ আলোচনা আছে। দারুল ঈমান প্রকাশনী, বৈরুত, লেবানন। প্রথম সংস্করণ ১৯৯৩।

মাধ্যমে। দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরে পাশ্চাত্যের দেশসমূহের সাথে মুসলিমদের লড়াই-সংঘাত চলে আসছিল। এই সময়ে একে একে প্রায় চারটি ক্রুসেড যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এসব যুদ্ধে মুসলিমদের হাতে ইউরোপীয় শক্তির শোচনীয় পরাজয়ের পর যখন তারা সম্মুখসমর বাদ দিয়ে সাংস্কৃতিক ও চিন্তাযুদ্ধ শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তখন থেকেই ইসলাম ধর্ম নিয়ে পাশ্চাত্যের ব্যাপক হারে অধ্যয়নের ধারা চালু হয়। ইসলামকে মূল থেকে জেনে ধর্মীয় বিভ্রান্তি সৃষ্টি, মুসলিমদেরকে খ্রিষ্টবাদের দিকে আহ্বান, ইসলামি জ্ঞানবিজ্ঞানের ভেতর সন্দেহের বীজ বপন করা-সহ আরও নানাবিধ চক্রান্ত শুরু হয়।

এই বিষয়ে মিশরের প্রখ্যাত আলিম ও গবেষক মুস্তফা সিবাঈ রাহিমাহুল্লাহ তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফী আত-তাশরীয়িল ইসলামী'-তে বলেন, 'ইউরোপীয় বিশ্ব ইসলামি রাষ্ট্রসমূহের ওপর সামরিক দিক দিয়ে পরাজয়ের পর একথা নিঃসন্দেহে অনুধাবন করে নিয়েছিল যে, ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে সম্মুখযুদ্ধের পরিবর্তে তাদের বিশ্বাস, শিক্ষা-সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের গভীরতা পর্যালোচনা করে তাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ওপর হামলা ব্যাপক কার্যকর ও ফলদায়ক হবে। সুতরাং, তখন ইউরোপীয় গোষ্ঠী ইসলামি রাষ্ট্রের ওপর তাদের সভ্যতা ও চিন্তাধারা অনুপ্রবেশের যুদ্ধে ব্যাপৃত হলো। আর এ থেকেই পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের বিভিন্ন দল অদ্যাবধি ইসলাম ও প্রাচ্যের জ্ঞানবিজ্ঞান, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে কলঙ্কিত করার অপচেষ্টায় রত রয়েছে।'[৪৬]

এই যুগেই সুনির্দিষ্ট ও পরিকল্পিত এজেন্ডা নিয়ে প্রাচ্যবাদ নানানভাবে ইসলামকে কলঙ্কিত করার ঘৃণ্য খেলা শুরু করে। ইসলাম ধর্মের নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গায়ে কালির দাগ বসানোর চেষ্টা করে। ইসলামের ইতিহাসকে বিকৃত করার চক্রান্তে মেতে ওঠে। ইসলামি বিধি-বিধানকে অযৌক্তিক ও বর্বর প্রমাণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। এর জন্য তারা নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি।

আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির প্রফেসর খালিক আহমদ নিজামী তাঁর রচিত একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, 'ক্রুসেড যুদ্ধের পর প্রাচ্যবিদদের চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতিতে মৌলিকভাবে পরিবর্তন সাধিত হয়। ইসলামি শিক্ষা, ইসলামের নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র জীবন এবং ইসলামি তাহযীব-তামাদ্দুন-এর এমন কোনো দিক বাকি ছিল না, যা তাদের বিদ্বেষপূর্ণ আক্রমণের নিশানা হয়নি। তারা তাদের সমগ্র শক্তি ইসলামকে অসভ্য ও বর্বর ধর্ম সাব্যস্ত করার পেছনে খরচ করে। কারণ তারা ভেবেছিল, এর মাধ্যমে খ্রিষ্টধর্মের প্রতিরক্ষা

[৪৬] উক্ত বইয়ের অনুবাদ—ইসলামী শরীয়াহ ও সুন্নাহ : ১৭৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

সম্ভব। এই যুগে যত ধরনের অপবাদ আছে তার সবটুকুই ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়। এগুলোকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে প্রচার করা হয়। এই যুগে প্রাচ্যবিদরা হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বিরুদ্ধে ইস্কান্দারিয়ার বিখ্যাত গ্রন্থাগার জ্বালিয়ে দেওয়ার হুকুম প্রদানের অপবাদ রটায়। তারা বিষয়টিকে এত বেশি প্রচার করেছে যে, প্রায় লোকই একে সত্য বলে ধরে নেয়। এই যুগে ইউরোপে মুসলিমদের বিপক্ষে উদ্দীপনা সৃষ্টির লক্ষ্যে অবাস্তব সব কথাবার্তা জাতীয় সংগীতে এমনভাবে অনুপ্রবেশ করানো হয় যে, যুদ্ধের ময়দানে এগুলো সুর করে গাওয়া হতো। এমনকি কাউকে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করার সময় এসব ভ্রান্ত বিশ্বাস তার ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়া হতো।'[৪৭]

কয়েক শতাব্দীব্যাপী এই যুগটি প্রলম্বিত ছিল। এই সময়টাতে প্রাচ্যবাদ তথ্যে ও তত্ত্বে বেশ সমৃদ্ধ হয়। ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মধ্যে ইসলামচর্চা বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। ইউরোপের ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গ এতে উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে। ফলে অনেক জায়গায় ইসলামি জ্ঞানচর্চা ও আরবি ভাষা শেখার জন্য স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানও তৈরি হয়। এর মধ্যে একজন প্রাচ্যবিদ কর্তৃক ম্যাজোরকা দ্বীপের মিরামার নামক স্থানে ভবিষ্যৎ খ্রিষ্টান মিশনারি গোষ্ঠীর জন্য একটি আরবি বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা অন্যতম। যা ১২৭৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২৯৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত চালু ছিল। এমনইভাবে ১৫৮৫ খ্রিষ্টাব্দে রোমে একটি ম্যারোনাইট কলেজ প্রতিষ্ঠিত করা হয় এবং ম্যারোনাইট যাজক ও শিক্ষার্থী শ্রেণিকে আরবি ভাষা বিষয়ে প্রশিক্ষণদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। ১৬২৭ খ্রিষ্টাব্দে ৮ম আরবান কর্তৃক 'কলেজ অব দি প্রপাগেশন অব ফেইথ' (College of the propagation of Faith) প্রতিষ্ঠিত করা হয়। যার মাধ্যমে মিশনারি কাজের জন্য প্রাচ্যদেশীয় ভাষা শিক্ষায় উৎসাহ প্রদান করা হয়।[৪৮]

আরবি গ্রন্থ অনুবাদের ক্ষেত্রে প্রথম যুগের সাথে দ্বিতীয় যুগের যে বড় পার্থক্য ছিল—তা হলো, প্রথম যুগে প্রাচ্যবিদদের মূল দৃষ্টি ছিল দর্শন, চিকিৎসা, জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিত প্রভৃতি জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাবলি অনুবাদ করার প্রতি। কিন্তু দ্বিতীয় যুগে এসে সেটা পালটে যায়। তখন তাদের অনুবাদের মূল আগ্রহ হয়ে ওঠে ধর্মীয় বিদ্যা সংক্রান্ত গ্রন্থগুলো। কর্মক্ষেত্রের এই বাঁক নেওয়ার পেছনে সবচেয়ে ক্রিয়াশীল ছিল যে বিষয়টি—তা হলো, ক্রুসেড যুদ্ধের প্রত্যক্ষ পরিসমাপ্তির পর ইউরোপ যখন অস্ত্রযুদ্ধের পরিবর্তে চিন্তাযুদ্ধ শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন তাদের প্রয়োজন হয়ে পড়ে ইসলাম, মুসলিম আর আরবদের সম্পর্কে প্রচুর তথ্য-উপাত্তের। আরবি ভাষায়

[৪৭] ইসলাম আওর মুস্তাশরিকীন : ২/১৩, দারুল মুসান্নিফীন, শিবলী একাডেমি, আজমগড়, ভারত, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৪ খ্রি.।
[৪৮] ইসলামী বিশ্বকোষ : ২০/৪০৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

লিখিত ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত বই-পুস্তককে অনুবাদ করা ছাড়া অন্য কোনোভাবে তা মেটানো সম্ভব ছিল না। ফলে তারা সেই পথেই হাঁটে এবং এই প্রয়োজন পূরণের যোগান দেওয়ার ভার এসে পড়ে প্রাচ্যবিদদের ওপর।

এতদিন ইসলাম ও আরবদেরকে নিয়ে গবেষণার জন্য রাষ্ট্রের কোনো উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজন পড়েনি। ফলে প্রাচ্যবাদের চর্চাটা হয়ে আসছিল ব্যক্তি উদ্যোগে বা চার্চ-গির্জার পৃষ্ঠপোষকতায়। কিন্তু এবার যেহেতু ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো অস্ত্রযুদ্ধের পরিবর্তে চিন্তাযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল, তাই প্রাচ্যবাদচর্চাকে জোরালো ও শক্তিশালী করা তাদের গুরুতর দায়িত্ব ও চিন্তাযুদ্ধের কৌশলের অংশ হিসেবে পরিগণিত হলো। এর সূত্র ধরেই ১৩১২ খ্রিষ্টাব্দে কাউন্সিল অব ভিয়েনা (The Council Of Vienna) একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যার মাধ্যমে আরবি ভাষা অধ্যয়ন একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। উক্ত সিদ্ধান্তে গৃহীত হয় যে, পাঁচটি ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়—যথাক্রমে রোম, বলোগনা, প্যারিস, অক্সফোর্ড ও স্যালামানকা—এর প্রত্যেকটিতে প্রাচ্যভাষা শিক্ষাদানের জন্য দুইজন করে পণ্ডিত নিযুক্ত করা হবে।[৪৯]

এই বিষয়ে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের আকীদা ও ইসলামি দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সাইয়িদ বলেন, 'অনেক প্রাচ্যতত্ত্ব ইতিহাসবিদ মনে করেন, এই সংস্থাটিই প্রাচ্যতত্ত্বের প্রাথমিক সহকারী প্রাতিষ্ঠানিক রূপ। এর আগে যে প্রাচ্যবাদ ছিল, তা মূলত এই আন্দোলন সংঘটিত হওয়ার পূর্বস্তর। এই ঘটনার পর পরই প্রাচ্যবাদ-বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও ইনস্টিটিউশন গড়ে উঠতে শুরু করে। যা সাধারণভাবে প্রাচ্যদেশীয় জ্ঞান-গবেষণা, বিশেষভাবে ইসলামি জ্ঞানবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণায় নিরত ছিল।'[৫০]

কাউন্সিল অব ভিয়েনার এই সিদ্ধান্তকে বলা যায় দ্বিতীয় যুগের অন্যতম প্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কারণ এই ঘোষণার হাত ধরেই প্রাচ্যবাদের আনুষ্ঠানিকভাবে পথচলার সূচনা হয়, যার মধ্যে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা সরাসরি সম্পৃক্ত ছিল। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার বন্দোবস্ত প্রাচ্যবাদের পালে হাওয়া দেয় এবং এই বিদ্যাকে খ্রিষ্টজগতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে সাব্যস্ত করতে সক্ষম হয়। যার ফলে আরবি বই-পুস্তক অনুবাদ এবং ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত পড়াশোনা ও গবেষণা আরও বেশি জোরদার হয়।

এই সময়ে পাশ্চাত্য দেশসমূহে আরবি গ্রন্থ মুদ্রণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখা যায়।

[৪৯] ইসলামী বিশ্বকোষ : ২০/৪০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
[৫০] ড. মোহাম্মদ সাইয়িদ, আল-ইস্তিশরাক ওয়াত তাবশীর : ১৫, দারু কুবা প্রকাশনী, ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত সংস্করণ।

যা সেখানকার প্রাচ্যবিদ পণ্ডিতদের আরবি ভাষার প্রতি প্রবল আগ্রহের প্রমাণ বহন করে। মূলত মুদ্রণ শিল্পের উদ্ভব ইউরোপে প্রাচ্যবাদ অনুশীলনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ইউরোপে প্রথম মুদ্রিত আরবি সংস্করণটির প্রকাশ ঘটে ১৫২৪ খ্রিষ্টাব্দে রোম নগরীতে। এটি ছিল খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠীর জন্য একটি খ্রিষ্টধর্মীয় বাণী সম্বলিত গ্রন্থ। ১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দে ভেনিস নগরীতে আরবি ভাষায় কুরআনের একটি সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছিল বলে অনুমিত হয়। কিন্তু পোপ ৩য় পল (ক্ষমতাকাল ১৫৩৪-৩৭ খ্রি.)-এর আদেশে এটির সম্পূর্ণ সংস্করণ ধ্বংস করে ফেলা হয়।

১৫৩৭ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে ডেনিয়েল নামক এক ব্যক্তি ভেনিসে একটি আরবি মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করেন। রোম নগরীতে বেশ কয়েকটি আরবি মুদ্রণযন্ত্র বিদ্যমান ছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ফার্ডিনান্ডের (Ferdinand de Medici) মুদ্রণযন্ত্র। এটি ১৫৮৬ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে স্থাপন করা হয়েছিল। এই যন্ত্র দ্বারা ১৫৯০ খ্রিষ্টাব্দে আরবি ভাষায় গসপেলের (Gospel) চার খণ্ড মুদ্রণ করা হয়।

অপর একটি বিখ্যাত আরবি ভাষা মুদ্রণযন্ত্র ছিল Francoise Savary de Breves কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ১৬১৩ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে এটি প্রথমে রোম নগরীতে স্থাপন করা হয়। এবং পরে ১৬১৫ খ্রিষ্টাব্দে প্যারিসে ভিন্ন নামে স্থানান্তরিত হয়ে বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করে।[৫১]

প্রাচ্যবাদের ইতিহাসে দ্বিতীয় যুগটাকেই বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। স্থায়িত্বের বিচারেও এই যুগটা অন্যান্য যুগের তুলনায় প্রলম্বিত। এই যুগেই প্রাচ্যবিদদের মাধ্যমে ইসলাম-বিরোধী মনোভাব চর্চার মালমশলা যোগানের কাজ সম্পন্ন হয়ে আসে। কারণ ক্রুসেড যুদ্ধের অবসান ঘটার পর ইউরোপীয় খ্রিষ্টান বিশ্ব যে চিন্তাযুদ্ধ ও সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের পথ বেছে নিয়েছিল, তার ফলে কয়েক শতাব্দীর ভেতর মুসলিমদের চর্চিত জ্ঞানবিজ্ঞানের বৃহৎ অংশ ভাষান্তরের মাধ্যমে ইউরোপের সীমানায় পৌঁছে গিয়েছিল। সেখানকার কলেজ-ইউনিভার্সিটি ও গবেষণাগারগুলোতে এসবের চর্চা হতো। এভাবে জ্ঞানবিজ্ঞানে এবং জাগতিক উন্নতি-উন্নয়নে ইউরোপ দ্রুততার সাথে অগ্রসর হতে থাকে। শক্তি-সামর্থ্যে এবং শিল্প-বাণিজ্যে এগিয়ে যেতে থাকে। ইউরোপে জ্ঞানের চর্চা ও নিত্যনতুন জিনিস আবিষ্কারের গতি যত জোরদার হচ্ছিল, মুসলিম বিশ্বকে দুর্ভাগ্যজনকভাবে তত বেশি স্থবিরতা ও নির্জীবতা গ্রাস করে নিচ্ছিল। সাধারণ ভোগ-বিলাস আর কোনোমতে জীবন পার করার মারাত্মক ব্যাধি তাদেরকে জেঁকে

[৫১] প্রতিটি তথ্য সূত্র-সহ আরও বিস্তারিত জানতে দেখুন—ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত 'ইসলামী বিশ্বকোষ'-এর 'মুস্তাশরিকুন' শব্দের অধীনে থাকা প্রবন্ধ।

ধরেছিল।

প্রাচ্যবাদচর্চার তৃতীয় যুগ

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এসে মুসলিম বিশ্ব ও ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যকার সামাজিক ও জ্ঞানগত ব্যবধানটা মোটামুটি বেশ বড়সড় হয়ে উঠেছিল। এরপর ইউরোপে দেখা দেয় শিল্পবিপ্লব। পুঁজিবাদের উদ্ভব, বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কার, কয়লার খনি আর ইস্পাতের ব্যাপক ব্যবহার বেড়ে যাওয়ার ফলে নিত্যনতুন কলকারখানা স্থাপিত হতে থাকে। উৎপাদিত পণ্য বিক্রি আর কলকারখানায় কাঁচামালের জোগান দেওয়ার জন্য তাদের দরকার হয়ে পড়ে নতুন বাণিজ্য এলাকার। এর জন্য এশিয়া ও আফ্রিকা অঞ্চলে অবস্থিত মুসলিম ভূখণ্ডগুলোকে নিজেদের উপনিবেশ বানিয়ে নেওয়া ছিল এই সমস্যার সবচেয়ে সহজ সমাধান। সেইসাথে মুসলিম দেশগুলোর প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য ও ভৌগলিক অবস্থান ইত্যাদি কারণেও পশ্চিমা ইউরোপীয়দের কাছে মুসলিম ভূখণ্ডগুলো ছিল লোভনীয়।

আমরা আগেই বলেছি, এই সময় ইউরোপ চিন্তা-গবেষণা ও আবিষ্কার-উন্নতিতে তরতর করে এগিয়ে চললেও মুসলিম দেশগুলো ছিল স্থবিরতায় আক্রান্ত। অবক্ষয় আর জ্ঞান-গবেষণার প্রতি অনীহা তাদেরকে পাশ্চাত্যের পেছনে নিয়ে গিয়েছিল। মুসলিমদের এই দুরবস্থা ইউরোপীয় খ্রিষ্টান সমাজের জন্য ছিল আশীর্বাদ।

এই সময় তারা নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য আঁটঘাট বেঁধে মাঠে নামে। মুসলিমদের ভাষা, তাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও স্বভাব-প্রকৃতি এবং তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক হারে গবেষণা করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। কারণ যে জাতির ওপর তারা দখলদারির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, তাদের বিষয়ে বিস্তারিত অধ্যয়ন ছিল জরুরি। এভাবেই প্রাচ্যবাদের সাথে সাম্রাজ্যবাদের আত্মীয়তা স্থাপিত হয়।

এই সময় তারা নিজেদের ইউনিভার্সিটি ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর খোঁজখবর নিয়ে সন্তোষজনক চিত্র দেখতে পায়। সপ্তদশ শতাব্দীতে (১৬৩৬ খ্রি.) ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে আরবি ভাষা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ইসলামি জ্ঞানভাণ্ডারে সমৃদ্ধ পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ও সেসব নিয়ে গবেষণা করার পারস্পরিক প্রতিযোগিতা শুরু হয়। যে যেভাবে পারল ইসলামি জ্ঞানের প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলো সংগ্রহ করা শুরু করল। এই বিষয়ে সামনে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

ঊনবিংশ শতকে এসে পাশ্চাত্য বিশ্বের হিংস্র থাবার মুখে পড়ে প্রাচ্যের দেশগুলো। ১৮২৩ সালে ফ্রান্স আলজেরিয়া দখল করে নেয়। ১৮৫৭ সালে ভারতবর্ষ চলে

যায় ব্রিটিশ সরকারের অধীনে। বিলুপ্তি ঘটে শত শত বছরের প্রাচীন মুসলিম মুঘল শাসন আমলের। কাছাকাছি সময়ে পর্তুগিজরা দখল করে নেয় ইন্দোনেশিয়া। ১৮৮২ সালে মিশর দখল করে ব্রিটিশরা। ১৯১১ সালে তুর্কিদেরকে হটিয়ে লিবিয়া দখল করে নেয় ইতালি। এভাবে দেখা যায়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইসলামি বিশ্ব পুরোপুরিভাবে পাশ্চাত্য দেশগুলোর হাতের মুঠোয় চলে যায়। এর মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের সাথে প্রাচ্যবাদের সম্পর্কটা আরও মজবুত হয় এবং একটার সাথে অপরটা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ে।

উপনিবেশের জমানায় দখলবাজ রাষ্ট্রসমূহ প্রাচ্যবিদদের প্রয়োজন অনুভব করে। ফলে সেসময় প্রাচ্যবিদদের একটা গোষ্ঠী উপনিবেশ দেশের পররাষ্ট্র, যুদ্ধ ও উপনিবেশ-বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে কাজ করে। যেমন : ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি ইত্যাদি।[৫২]

এই সময়কালে অধিকাংশ মুসলিম দেশগুলো ছিল তুরস্কের উসমানি খিলাফতের অধীন। উসমানি খিলাফতের আলোর পিদিম তখন নিভুনিভু প্রায়। ফলে যে যেভাবে পেরেছে, নানা দিক দিয়ে আক্রমণ করে আরব দেশগুলো তাদের থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। ১৯২৩ সালে তুর্কি খিলাফতের পতনের মধ্য দিয়ে এই যুগের অবসান হয়েছে বলে মনে করা হয়। এই যুগে ক্রুসেডীয় সময়ের শত্রুভাবাপন্ন অবস্থা পরিহার করে বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব গ্রহণ করার কৌশল গৃহীত হয়। তবে তাদের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অপরিবর্তিতই থেকে যায়।

এ যুগের অবস্থা সম্পর্কে মুস্তফা সিবাঈ রহমাতুল্লাহি আলাইহি যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন—তা এরূপ, 'অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে শুরু হয় পশ্চিম কর্তৃক মুসলিম জাহানের ওপর সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের নতুন পর্ব। এতদিন যারা আরবদের অধীন হয়ে ছিল, এখন তারাই মুসলিম জাহানের ওপর শাসনের ছড়ি ঘোরাতে শুরু করল। এই সময় পাশ্চাত্যে জন্ম নেয় প্রাচ্যবাদে বিশেষজ্ঞ বড় একটি গোষ্ঠী। তারা নিজেদের স্বার্থে পাশ্চাত্য দেশসমূহে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করে এবং আরব ও ইসলামি রাষ্ট্রসমূহে থাকা পাণ্ডুলিপিগুলো হাতিয়ে নিতে থাকে। মূর্খ লোকদের থেকে সেগুলো কিনে ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত লাইব্রেরিগুলো থেকে চুরি করে নিজেদের দেশে তারা সেগুলো পাচার করা শুরু করে। এভাবেই পাণ্ডুলিপির বিশাল বড় একটা অংশ ইউরোপে স্থানান্তরিত হয়ে যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে যার পরিমাণ দাঁড়ায় দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজারে। এই সংখ্যাটা দিন দিন বেড়েই চলেছে।'[৫৩]

---

[৫২] ড. আলি ইবনু ইবরাহীম আন-নামলাহ, কুনহুল ইস্তিশরাক : ৫২, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১১ খ্রি.।

[৫৩] মুস্তফা সিবাঈ, আল-ইস্তিশরাক ওয়াল মুস্তাশরিকুন : ১৯।

আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির প্রফেসর খালিক আহমদ নিযামী এই যুগের প্রাচ্যবিদদের মূল্যায়ন করেছেন নিম্নোক্ত ভাষায়,

'এই যুগের প্রাচ্যবিদরা বিষের তিক্ততাকে পর্যালোচনা-গবেষণার মধুরতায় এমনভাবে লুক্কায়িত করেছিল যে, তাদের কর্মে সেই তিক্ততার ছটা অনুভব করা না গেলেও বিষের ক্রিয়া ঠিকই বহাল ছিল।'[৫৪]

এই সময়টাকে আধুনিক প্রাচ্যবাদের আরম্ভকাল বলে অভিহিত করেছেন এডওয়ার্ড সাঈদ। তিনি বলেন, 'উনিশ ও বিশ শতকে প্রাচ্যতত্ত্ব বেশ কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন চেহারা গ্রহণ করে। সর্বপ্রথম ইউরোপীয় অতীত থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া প্রাচ্য বিষয়ে বিশাল এক সাহিত্যভাণ্ডার ছিল ইউরোপের। বর্তমান আলোচনায় আধুনিক প্রাচ্যতত্ত্বের আরম্ভকাল ধরা হয়েছে শেষ-আঠারো শতক ও উনিশ শতকের শুরুর পর্বকে। এ পর্বের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, এই সময়েই প্রাচ্যতত্ত্বের পুনর্জাগরণ ঘটে। হঠাৎ-ই বিভিন্নমুখী একদল চিন্তাবিদ, রাজনীতিবিদ, শিল্পীর মধ্যে নতুন করে সচেতনতা দেখা দেয় চীন থেকে মেডিটেরেনিয়ান পর্যন্ত বিস্তৃত প্রাচ্য সম্পর্কে। এ সচেতনতা ছিল সংস্কৃত, জেন্দ[৫৫] ও আরবি ভাষার নব-আবিষ্কৃত ও অনূদিত সাহিত্যের ফলাফল আর অংশত নতুনভাবে উপলব্ধ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্পর্কের পরিণাম।'[৫৬]

প্রাচ্যবিদরা আধুনিক যুগে প্রবেশ করার পর অনেক ক্ষেত্রেই নিজেদের কৌশলে পরিবর্তন আনে। কারণ ততদিনে অনেক উত্থান-পতন ঘটে গেছে। ইউরোপ তাদের উপনিবেশগুলো ছেড়ে চলে গিয়েছে। যদিও তাদের চিন্তা-চেতনা আর আদর্শের জিঞ্জির সার্থকভাবেই পরিয়ে যেতে পেরেছে প্রাচ্যের বড় একটা গোষ্ঠীকে। এই সময়ে প্রাচ্যবিদদের গৃহীত নতুন কৌশলগুলোর মধ্যে একটা হলো প্রাচ্যবাদের নাম পরিবর্তন।

ইতিমধ্যে এই বিষয়ে মুসলিমরা সচেতন হতে শুরু করেছে। প্রাচ্যবিদদের কাজকর্ম ও তাদের কলাকৌশল নিয়ে নানাবিধ গ্রন্থ রচনা শুরু করেছে। যার ফলে প্রাচ্যবিদদের চরিত্র ও তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য মানুষের সামনে আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। তাই প্রাচ্যবাদের পরিবর্তে এখন আমরা দেখতে পাই 'মধ্যপ্রাচ্য গবেষণা' ও প্রাচ্যবিদদের পরিবর্তে 'মধ্যপ্রাচ্য বিশেষজ্ঞ'-এর মতো নতুন কিসিমের পরিভাষা।

---

[৫৪] ইসলাম আওর মুস্তাশরিকীন : ২/১৫, দারুল মুসান্নিফীন, শিবলী একাডেমি, আজমগড়, ভারত, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৪ খ্রি.।

[৫৫] প্রাচীন পারস্যের ভাষা (Zend)

[৫৬] এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদের নির্বাচিত রচনা : ৬৬, সংবেদ প্রকাশনা, প্রথম প্রকাশ ২০১২।

এসব শব্দ শারীরিক অবয়বের দিক দিয়ে ভিন্ন হলেও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে অভিন্নই। এ যেন নতুন বোতলে পুরাতন মদের পরিবেশনা। মধ্যপ্রাচ্য গবেষণা নামক এই নতুন পরিভাষাটির উদ্ভব ঘটে পঞ্চাশের দশকের পর থেকে। শব্দটির জন্মদাতা যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়াগুলো এবং সে দেশের নানান সংগঠন।